রাজনীতিতে ভক্তি, ভীতি ও ভ্রষ্টাচার : গণতন্ত্রের অন্তরায়

ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

জাতপাত, ধর্মীয় বিভেদ ও আঞ্চলিকতাবাদের প্রসার ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজজীবনের উপর বিভেদপন্থী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দ দুজনেই জাতীয় বিকাশের জন্য দুটি মূল সূত্র চিহ্নিত করেছেন। একটি হলো আত্মশক্তি ও সংগ্রামী চেতনা, আর অন্যটি হলো সাধারণ মানুষের মানোন্নয়ন। অজ্ঞ, দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষকে উন্নয়নের পথে টেনে নিয়ে যেতে হবে। অন্যদিকে স্বামীজী বরাভয় মন্ত্রে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন, 'কোনও কিছুতেই ভয় পাইও না। যে মুহূর্তে তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমরা শক্তিহীন।'

উনিশ শতকের শেষ দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা অনুসন্ধান করে ভক্তি ও দাসত্ববোধকে কশাঘাত করেছিলেন। তিনি বিত্তবান ও বিত্তহীন ভারতীয় সমাজের চরিত্রগত বিভেদ ও বৈষম্য তুলে ধরেছিলেন। কমলাকান্তের দপ্তরে তিনি এই বৈষম্য অনবদ্য ভাষায় শ্লেষের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্গদেশের কৃষক শীর্ষক রচনায় ভূস্বামী সম্প্রদায়ের শোষণের কথা বলতে গিয়ে মানুষ মানুষের মাংস ভক্ষণের কথা মন্তব্য করেছেন। আর সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কীভাবে ইংরেজ শাসকদের প্রতি আনুগত্যবোধের জালে আবদ্ধ ছিলেন তার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা মেলে 'ইংরাজ স্তোত্র' নামক লেখায়। রায়বাহাদুর, কাউন্সিলার হওয়ার জন্য বিত্তবান মানুষেরা ইংরেজ প্রভুর কাছে আকুতি মিনতি করছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবাসীকে ইংরেজের প্রতি দাস্যভাব ত্যাগ করে 'বৃষসুলভ' আচরণের নির্দেশ দেন। আর তাঁর লেখা 'বন্দে মাতরম্' সংগীত জাতীয় সংগ্রামের রণধ্বনিতে পরিণত হলো।

ড. বি আর আম্বেদকর

এরপর ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পেল। তিন বছর ধরে গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য ও শাসনবিধি রচনায় ব্যস্ত রইল। অবশেষে ভারত গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হলো। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং কেন্দ্রে ও রাজ্যে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক মানসিকতা ও পরিবেশ। তিনটি ব্যাধি ভারতীয় সমাজে ও জনমানসে প্রবলভাবে সংক্রমিত হয়েছে। এগুলি হলো— ভক্তিবাদ, ভয়ভীতি আর দাসত্ববোধ। স্বাধীনতার পূর্বেই জাতীয় আন্দোলনের সময় এই সব নেতিবাচক প্রবণতার স্ফুরণ ঘটে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ড: বি আর আম্বেদকর সংবিধানসভায় প্রদত্ত ভাষণে (২৫ নভেম্বর, ১৯৪৯) খোলাখুলি জানালেন যে, ভারতে রাজনীতির আঙ্গিনায় যে আনুগত্য ও ভক্তিভাবের প্রবল বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, সারা বিশ্বে আর কোথাও এমন নজির নেই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই ব্যাধির প্রকোপ আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মতে, দীর্ঘদিন বিদেশি শাসনের জালে আবদ্ধ থাকায় ভারতবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস ও প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষয় হতে থাকে। তাই নির্ভীক চিত্তে

এগোনোর স্পৃহা অবদমিত হয়। আম্বেদকর ভারতের রাজনৈতিক অবক্ষয়কে মানসিক বৈকল্যের স্বাভাবিক পরিণতি বলে চিহ্নিত করেছেন। আম্বেদকরের ভাষায়, "In India, Bhakti or what may be called the path of devotion or hero worship plays a part in its politics unequalled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world"। এই ভক্তিবাদী রাজনীতির প্রধান দৃষ্টান্ত ছিলেন গান্ধীজী ও মহম্মদ আলি জিন্না। স্বাধীনতার পূর্বে জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীজীই ছিলেন শেষ কথা। গান্ধীজীর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে কেউ রেহাই পাননি। তাঁর পথ ও পন্থা নির্বিচারে মেনে নিতে হবে। অসহযোগ আন্দোলনের কথা ভাবুন। জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে ইসলামিয় খিলাফতের দাবিকে মিলিত করে তিনি হিন্দু-মুসলমানের যৌথ আন্দোলনের সূচনা করলেন। এর পরিণাম হলে ভয়ঙ্কর। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ফাটল ধরে। দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রকোপ বাড়ল। মহম্মদ আলি, শওকত আলির মতো গান্ধীজীর অনুগামী মুসলমান নেতারা বিপক্ষে চলে গেলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীজী ভজনায় অবিচল থাকলেন। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে কংগ্রেসে কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। তিনি ছিলেন আপোশহীন সংগ্রামী রণকৌশলের প্রবক্তা। শেষপর্যন্ত তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়। রাজাগোপালাচারী শ্লেষযুক্ত মন্তব্য করেছিলেন। তাঁরা গান্ধীজীর নিরাপদ নৌকায় থাকতে চান, ফুটো নৌকার যাত্রী হতে চান না। আবার মধ্যপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী এন বি খারে কংগ্রেসের সমালোচনা করায় তাঁকে গদিচ্যুত করা হয়।

আম্বেদকর শুধু গান্ধীজীকে নয়, মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাকে সমালোচনা করতে ছাড়েননি। তাঁর মতে, গান্ধীজী ও জিন্না দুজনেই ছিলেন একরোখা (ego centric) চরিত্রের। গান্ধীজী নিজেকে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের একমাত্র কাণ্ডারি বলে মনে করতেন, আর জিন্না নিজেকে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রবক্তা হিসাবে জাহির করতেন। মুসলমান রাজনীতির তিনিই শেষ কথা। ভাগ্যের পরিহাস, গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের ভুলভ্রান্তি জিন্নাকে সুযোগ এনে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কংগ্রেসের ব্যবধান বাড়তে লাগল ও কংগ্রেস সংঘাতের পথ বেছে নিল, তখনই ব্রিটিশের কাছে জিন্না প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। গান্ধী ও জিন্নার অনমনীয় মনোভাব জাতীয় রাজনীতিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি করল। পরিণামে দেশব্যাপী হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। অহিংসার পূজারি গান্ধীজী দেখলেন ভারত অগ্নিগর্ভ ও রক্তস্নাত।

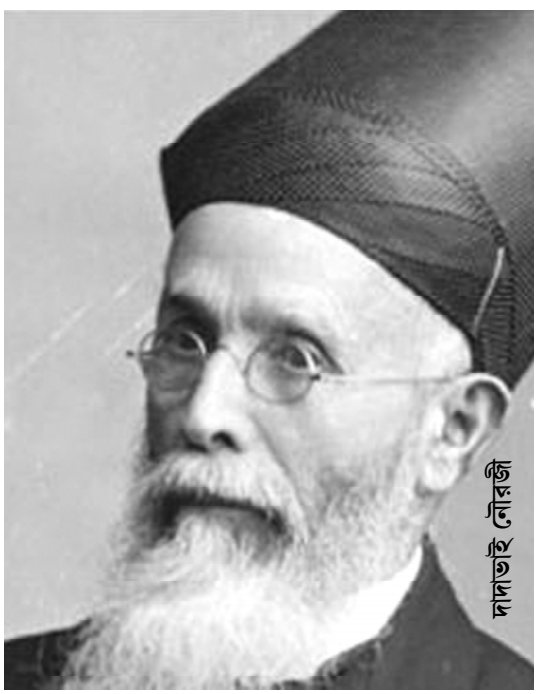
দাদাভাই নৌরজী

স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আমলে গণতান্ত্রিক নিয়মবিধি কিছুটা বহাল ছিল। তবে নেহরুকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস দলের নেতা-কর্মীরা নেহরু-ভজনা শুরু করেন। নেহরু অবতারের পর্যায়ে উন্নীত হন। অনেক আগে ১৯৩৭ সালে নেহরু 'চাণক্য' ছদ্মনামে রচিত মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখায় আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, নেতার বন্দনা সুস্থ রাজনীতির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে নেতার মনে অহমিকাবোধ দেখা দিতে পারে এবং একনায়ক হওয়ার বাসনা জাগতে পারে। নেহরুর পর কংগ্রেস দলে এমনটাই হয়। তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস দলে নিজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। এরই পরিণতি পারিবারিক গণতন্ত্র। ১৯৭৫ সালে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সারা দেশে গণতন্ত্রের বনিয়াদ ধ্বংস করেন। এই সময়ে ইন্দিরা-ভজনার মাত্রা চরমে ওঠে। কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া সোচ্চারে বললেন, 'ইন্দিরাই ভারত' (Indira is India)। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হলো। বিচারব্যবস্থার উপর আঘাত নামল। ইন্দিরাপুত্র সঞ্জয় অসাংবিধানিক ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হলেন। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা ক্ষমতাচ্যুত হলেও ১৯৮০ সালে পুনরায় ক্ষমতায় বসলেন। এরপর ১৯৮৪ সালে ইন্দিরার প্রয়াণের পর তাঁর পুত্র রাজীব সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসলেন। রাজীবের প্রয়াণের পর কিছুদিন পরিবারতন্ত্রের দাপট কমেছিল। কিন্তু ১৯৯৮ থেকে বিশ বছর ধরে রাজীবপত্নী সোনিয়া কংগ্রেস দলের সভানেত্রীর পদে বহাল ছিলেন। কংগ্রেসের ইতিহাসে এ এক বিরল ঘটনা। মহাত্মা গান্ধী একবছর

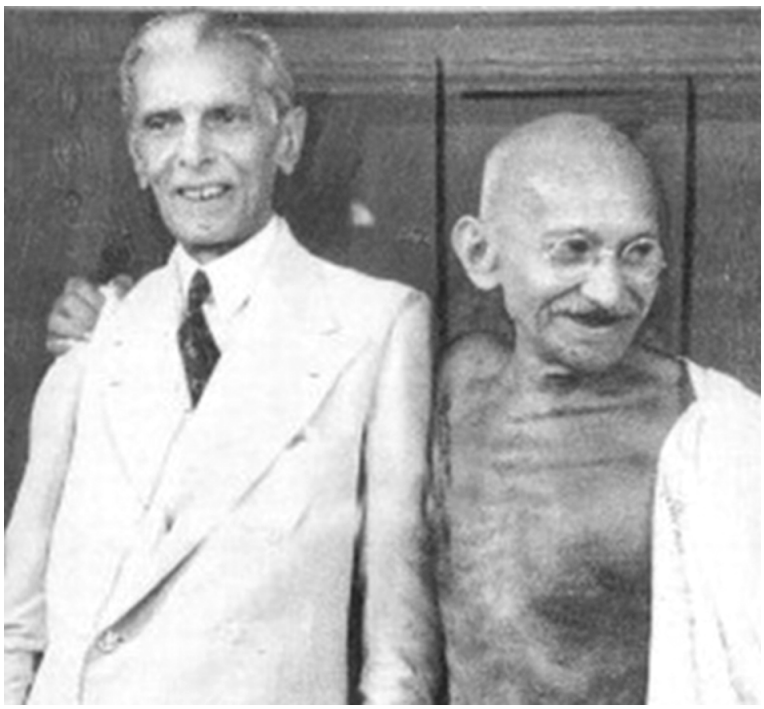

জিন্না ও গান্ধীজী

কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন। ২০১৭ সালের শেষদিকে সোনিয়াপুত্র রাহুল গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি পদে বসেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের চত্বরে এখন রাহুল-বন্দনার দাপাদাপি চলছে।

কিন্তু শুধু কংগ্রেস দল নয়। সোশ্যালিস্ট পার্টি, আরজেডি প্রভৃতি দলে পরিবারতন্ত্র আসর জমিয়েছে। মজার কথা, যে আম্বেদকর রাজনীতিতে ভক্তিবাদের তীব্র বিরোধী ছিলেন, তাঁর ভিত্তিতে গঠিত বহুজন সমাজ পার্টির সুপ্রিমো মায়াবতী সমর্থকদের ভজনায় আপ্লুত। পশ্চিমবঙ্গেও ক্ষমতাসীন দলের মহানেত্রী সমর্থকদের ভক্তিরসে আপ্লুত। সরকারের সব কাজকর্ম তাঁর অনুপ্রেরণায় চলছে। পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের অনুপ্রেরণায় কি সমস্ত কাজকর্ম চলত? তোষামুদেরা ক্ষমতাসীন নেতা-নেত্রীদের ভজনা করেন নিজেদের স্বার্থে, নেতা-নেত্রীর মর্যাদার জন্য নয়।

আবার ফিরে আসি আম্বেদকরের ভাষ্যে। স্বাধীনতা, সমতা ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মুক্ত চিন্তার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস। তাঁর ভাষায় শিক্ষার প্রসার, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ও আন্দোলন এই তিনের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা সম্ভব। অনেক আগে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া ভাষণে ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য বাক্‌স্বাধীনতা ও সংগঠিত প্রচেষ্টার কথা বলেছিলেন। ব্রিটিশ ভারতে আমলাতন্ত্র ছিল সর্বশক্তিমান। এই আমলাতন্ত্রের কঠোর শাসন প্রতিহত করে জাতীয় আত্মবিকাশের কথা বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। আর স্বাধীন ভারতে কী দেখছি? গণতন্ত্রের পোশাক পরে ক্ষমতাসীন দলগুলির দাপট ও নিয়ন্ত্রণ চরমে উঠেছে। ভোটে জেতার জন্য ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির পাশাপাশি অর্থশক্তি ও পেশীশক্তির নির্লজ্জ প্রসার ঘটেছে। এমনটা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ বামফ্রন্টের শাসনে। দলতন্ত্রই হয়ে উঠেছিল শেষ কথা।

ভাবতে পারেন, পেশাদারি রাজনৈতিক দলের নেতারা অনৈতিকভাবে ক্ষমতায় বসেন আর সংবিধানের নামে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নেন। কিন্তু তারপরেই গণতন্ত্র ও সংবিধানকে লঙ্ঘন করতে সচেষ্ট হয়। মুখে ধর্ম ও মানবিকতার কথা বলতে শোনা যায় আর প্রতিনিয়ত অধার্মিক ও অনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। 'সত্যমেব জয়তে'র আড়ালে 'মিথ্যামেব জয়তে' প্রকট হয়ে উঠেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক সমতার বুলি আউড়ে ধর্মীয় ও সামাজিক বিভেদকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচন যেন সত্যই মহাভারতের যুদ্ধের আকার নেয়। কংগ্রেস সভাপতি নিজের অজান্তে ২০১৯ সালের নির্বাচনকে মহাভারতের যুদ্ধের প্রতিরূপ বলেছেন। মিথ্যাচার, শঠতা, পেশীশক্তির দুঃসহ আস্ফালন, জাতপাত ও আঞ্চলিকতার ভেদাভেদের বিষবাষ্প, যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা দূর করে দেশের সংস্কৃতি ও সংহতি সুনিশ্চিত হোক, অন্ধকার বিদীর্ণ করে নবভারতের উদয় হোক। দেশ ও সমাজকে টুকরো টুকরো করার হীন অপচেষ্টার সমূলে বিনাশ ঘটুক। উনিশ শতকের ভারতের জাতীয়তাবাদের ঊষালগ্নে প্রাজ্ঞ মহান ব্যক্তি দাদাভাই নওরোজি তিনটি গলদের কথা বলেছিলেন—রাজনৈতিক দারিদ্র্য (Political Poverty), অর্থনৈতিক দুরবস্থা (Economic Poverty) ও নৈতিক অবক্ষয় (Moral Povety)। বর্তমান ভারতের দুঃসহ পরিস্থিতির মূলে নৈতিক অবক্ষয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নীতি নৈতিকতাহীন। ঘরে বাইরে সংকট সৃষ্টির অশুভ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, আপাত ভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতের মর্মবাণী হলো ঐক্য, ভারতমাতা হলো ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। এককালের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতের অন্তর্নিহিত মৌলিক ঐক্য প্রসঙ্গে লিখেছেলেন, 'India and Hinduism are organically related like body and soul'। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ভারত ও ভারতবাসীর এই অবিভাজ্য ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করতে চাইছে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলি। অশুভ মহাজোটের ডাক এরই পদধ্বনি।

■

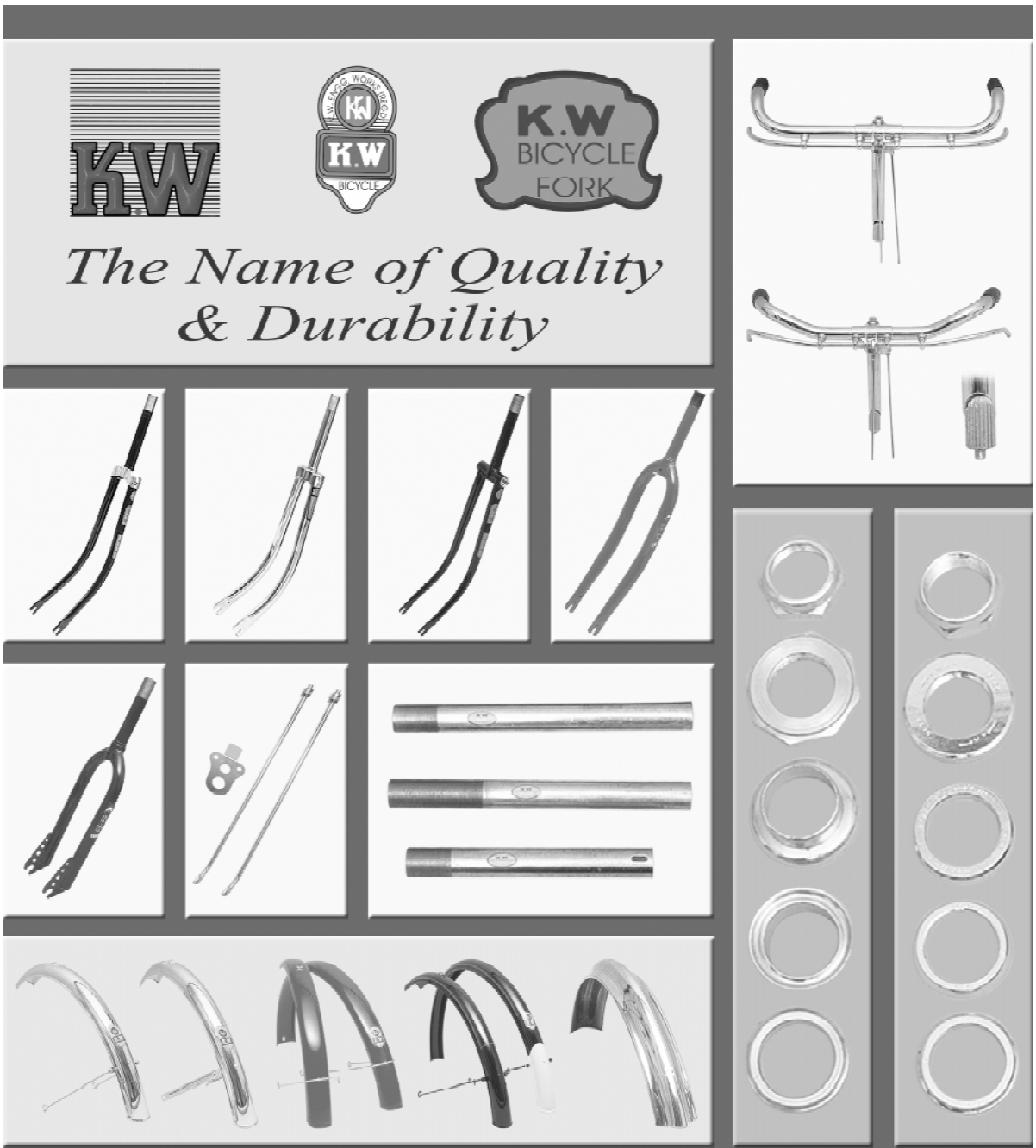

K.W
K.W
K.W
BICYCLE
FORK
The Name of Quality
& Durability
K. W. Engineering Works (Regd.)
B-11, Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA
Phones : +91-161- 2670051-52-, 2676633
Fax : +91-161-2673250,
E-mail : sales@kwcycles.com,kwengg@sify.com
Website : http:/www.kwcycles.com

With Best Compliments From :

emami

EMAMI PAPER MILLS LIMITED

AN IS0 9001 : ISO 14001 : 0HSAS 18001 CERTIFIED COMPANY

Manufacturers of

International Quality Packaging Board

Coated Grey Back Board, Folding Box Board and SBS Board (White)

High Quality White and Pink Newsprint

S. S. Maplitho, Writing & Printing and Ledger Paper.

* * *

Registered Office :

1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba, ACROPOLIS, Unit No. -1
15th Floor, Kolkata - 700 107, (West Bengal)
Phone : 6627-1300/1301, Fax : (033) 6627-1338
E-mail : emamipaper@emamipaper.in
Website : www.emamipaper.in

FOR BUSINESS ENQUIRY - CONTACT :
Mr. Soumyajit Mukherjee, Asst. Vice President (Marketing and Sales),
Mob. +91 9051575554, E-mail : soumyajit@emamipaper.in

Unit Gulmohar
R. N. Tagore Road
Alambazar, Dakshineswar
Kolkata - 700 035 (West Bengal)
Phone : 2564-5412/5245/ 65409610-11
Fax : (033) 2564-6926
E-mail : gulmohar@emamipaper.in

Unit Balasore
Vill. - Balgopalpur
P. O. Rasulpur,
Dist. - Balasore (Odisha) - 756 020
Phone : (06782) 275-723/779
Fax : (06782) 275-778
E-mail : balasore@emamipaper.in

উপন্যাস

হাতি ঘোড়া পাল কী

জিষ্ণু বসু

বহুদিনের প্রতীক্ষার অবসান হলো। সোপানের কাছে আজকের সকালটা ভীষণ ভীষণভাবে অন্যরকম। প্রথমে তো গণদেবতা এক্সপ্রেস ধরার জন্য এত সকালে উঠতে হবে শুনে বিরক্ত লাগছিল সোপানের। কিন্তু আজ সকাল হওয়ার অনেক আগেই কে যেন ওকে জাগিয়ে দিয়েছিল, 'সোপান কি রে ওঠ, উঠে পড়! যাবি না? দ্যাখ ভোরটা কত সুন্দর।'

সকালের আলো তখনও ভালো করে ফোটেনি। সোপান উঠে পড়ল, ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে একেবারে ছাদে উঠে গেল। উঠে অবাক হয়ে গেল, কী সুন্দর পাখির ডাক। আম গাছে, বাতাবি লেবু গাছে, অশোক ফুলের গাছে কত কত পাখি! কী অদ্ভুত কলরব। সব পাখিরা কী এত বলছে? ছাদে উঠে এক অপূর্ব অনুভূতি হলো সোপানের। ঊষা!

এই সময়টাকেই তো দাদাই বলতেন ঊষা।

'ডাকে পাখি না ছাড়ে বাসা,
খনা বলে সেই তো ঊষা।'

কবিতা করে বলতেন দাদাই। ভাবতেই বুকের ভেতরটা কষ্টে ঢুকরে উঠল, গলার কাছটা একটা কান্না দলা বেঁধে। আজ চার বছর হলো দাদাই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। তখন সোপান ক্লাস সিক্সে পড়ত। মা বলেছিলেন, দাদাই তারা হয়ে গেছে। সোপান তখন তো বড়, মানুষ মারা গেলে সে ফিরে আসে না সেটুকু বুঝতে শিখে গেছে সে। তবু যেন মায়ের কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করত। অনেকদিন সন্ধ্যায় ছাদে উঠে খুঁজতে চেষ্টা করত নতুন কোন তারা। কিন্তু আজ একদম দেরি করলে চলবে না। মনে হতেই তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল সে।

মা প্রস্তুত হয়ে এসে অবাক, সোপান জামা-কাপড় পরে একেবারে প্রস্তুত। সঙ্গে নিয়েছে ওর প্রিয় জলপাই রঙের কিট্স ব্যাগ। ব্যাগ গুছোতে অবশ্য দিদি অনেকটাই সাহায্য করেছে। সত্যি দিদিটার হাতে জাদু আছে। বাবাও যখন ট্যুরে যান, তখনও তুলির ডাক পড়ে। বাবা দিদিকে আদর করে বলেন, 'তুলতুলে'।

বাবার ট্যুরের আগেরদিন সন্ধ্যায় অবধারিতভাবে ডাক আসবে, 'তুলতুলে, মা দ্যাখ তো আমার লাগেজটা একটু ম্যানেজ করতে পারিস কিনা?'

দিদি পড়াশুনা ছেড়ে এসে বাবার লাগেজ নিয়ে গুছোতে শুরু করে। এত এত জামাকাপড়, ছোট বড় কাজের জিনিস ঠিক সাজিয়ে গুছিয়ে ভরে দেবে স্যুটকেসে।

আজকাল বাবা ঠাট্টা করে দিদিকে 'ভৈরবী'ও বলেন। কারণ এখন দিদির ঘরে মানুষের হাড়গোড় ভরা থাকে। দিদি মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বছরের ছাত্রী। তাই সারাদিন মোটা মোটা বই আর মানুষের হাড় মিলিয়ে পড়া দেখে বাবা হাসতে হাসতে বলেন, 'তন্ত্র সাধনা চলছে? ভৈরবী সাধনা ছেড়ে একটু প্রসাদ নিয়ে যাবেন কি?'

দিদিও বই থেকে মাথা না তুলেই বলে, 'কী আছে প্রসাদে?'

বাবাও বাধ্যের মতো বলেন, 'বেশি কিছু না, সামান্য একটু ফিশফ্রাই আর রাশিয়ান স্যালাড। তার মধ্যে সোপান অলরেডি দু-পিস সাঁটিয়ে দিয়েছে।'

দিদি, 'যাচ্ছি' বলেই লাফিয়ে চলে আসে। টেবিলে বসতে যাওয়ার আগেই মায়ের চিৎকার, 'এই তুলি, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আয়। হাইজিনের বিন্দুমাত্র সেন্স নেই! তোকে দেখে কেউ বলবে একটা ডাক্তারির স্টুডেন্ট?'

বাবা মিটি মিটি হাসতে হাসতে মুখ নীচু করে খেতে খেতে বলেন, 'না, তোর মাকে দেখে মনে হয়!'

মা চোখ বড় বড় করে তেড়ে আসেন, 'তোমার আস্কারাতেই বাচ্চা দুটো দিনদিন ...

দিদি হাত ধুয়ে এসে টেবিলে বসতে বসতে দু-হাত উপরে তুলে বলে, 'ঠিক আছে, শান্তিঃ শান্তিঃ।'

সোপান মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে কিছুদিন মামাবাড়ি গিয়ে থাকবে। সেটা বহুদিন থেকেই ঠিক হয়েছিল। প্রথমে কথা ছিল, দিদিও ক'দিনের জন্য যাবে। কিন্তু দিদির ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা জুন মাসে, তাই ও যাবে না। দিদি থাকলে সোপানের একটা আলাদা সাহস আসে। কিন্তু মুখে সেটা কখনো বলে না।

এবারও সোপান একটু আপত্তি করেছিল, 'তুই কেন যাবি না? এমনিতেও তো সারাদিন হোয়াটস্ আপ করিস! চল না...'

দিদি একটু ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, 'তুই নিজের চরকায় তেল দে! আমার পড়া তুই বুঝবি?'

তারপর কী একটা দুষ্টুমি মাথায় এল, গালে টোল ফেলে একটু হেসে বলল, 'অকালীপুরে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। হোয়াটস্ আপ করা যাবে না, তাই যাব না।'

সোপান তারপরেও গজগজ করছিল, 'এই জন্য তোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ডাক্তারনি হবে তাই বড় ঘ্যাম হয়েছে! দেখিস তোর কী হয়!'

বাবা মধ্যস্থতা করতে আসেন হাসতে হাসতে। সোপানের মাথায় হাত দিয়ে বলেন, 'বাবা, দিদিকেও নিয়ে গেলে আমাকে রান্না করে কে খাওয়াবে? দিদিকে ছেড়ে দে।'

আজ ভোর থেকে কিন্তু দিদি সোপান আর মায়ের জন্য গরম গরম হালুয়া আর পরোটা তৈরি করেছে। ওদের ট্রেনে যাওয়ার জন্য হটপটে ভরেও দিয়েছে। তবে তৈরি হওয়ার পরেই সোপান একটু হালুয়া খেয়ে নিয়েছে। সকাল সকাল এক কাপ দুধ, মোটা চা আর ঘি চপচপ হালুয়া খেয়ে মনটা ভরে

গেল।

এদিকে বাবা তাড়া দিচ্ছেন, 'বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো। এরপর ট্রেন মিস করবে তোমরা।'

গণদেবতা এক্সপ্রেসের আরেক নাম 'হুল এক্সপ্রেস'। ট্রেনে উঠে সিটের নীচে বড় লাগেজটা ঢুকিয়ে দিল সোপান। নিজের কিটস্ ব্যাগটা উপরের বাঙ্কে তুলে দিয়ে ধপাস করে সিটে বসে পড়ল। আরাম করে বসে সোপানের মনে প্রশ্ন এল— 'মা কী মজার নাম দেখেছে ট্রেনটার? হুল, হুল ফোটাবে নাকি?'

মা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'সে কি রে, তুই হুল মানে জানিস না?' তারপর যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোদের বা কী দোষ? নিজেদের দেশের বিষয়ে কতটুকুই বা পড়ানো হয় ইতিহাসে?'

সোপান একটু লজ্জা পেল, 'কী মানে গো হুল কথাটার?'

'হুল একটা সাঁওতাল শব্দ, মানে হল বিদ্রোহ। ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রথম বিদ্রোহ করে ছোটনাগপুর মালভূমির সাঁওতালরা। তাই সিধু-কানুর সেই বিদ্রোহকে ওখানকার ভাষায় হুল বলা হয়।'

ট্রেন ছেড়ে দিল। জানলার বাইরে থেকে বাবা হাত নাড়তে নাড়তে ক্রমশ ছোট হয়ে গেলেন।

উল্টোদিকের সিটে বসেছে একটি পরিবার। বাবা, মা আর দুই বোন। শ্রাবণী আর সর্বাণী। শ্রাবণী ক্লাস ফাইভে পড়ে, সর্বাণী মোটে ক্লাস থ্রিতে। সর্বাণীরা পূজা দিতে যাচ্ছে তারাপীঠে। ওরা রামপুরহাটে পৌঁছেই পুজো দিতে যাবে, তাই সকালে কিছু খাবে না। সেই নিয়ে সর্বাণীর খুব আপত্তি।

'কেন একটু কিছু খাওয়া যাবে না? তারা মা তো আমাদের সবাইকে খুব ভালোবাসেন। সকালে দু-চামচ গুঁড়ো দুধ খেলে কী হয়?'

ওদের সঙ্গে মজা করতে করতে সময় কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে এক ভদ্রলোক মায়ের নাম ধরে ডাকলেন।— 'তুহিনা না? কোথায় যাচ্ছিস?'

মা ফিরে দেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন— 'শুভায়ু, শুভায়ু চ্যাটার্জি। কেমন আছিস? বাব্বা কতদিন পরে দেখা! তুই কোথায়?'

'আরে আমি এই ট্রেনের সাপ্তাহিক যাত্রী। বিশ্ব ভারতীতে চাকরিও প্রায় ২০ বছর হয়ে গেল। কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট আছে, সপ্তাহে একদিন ফিরি।'

মা এতদিনের পুরনো বন্ধুকে পেয়ে খুব খুশি। 'কিরে, না হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়েছিস, তা বলে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবি না?'

শুভায়ুবাবু থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা বাব্বা, তোকে খোঁজার তো কত চেষ্টা হয়েছে। আমাদের তো হোয়াটস্ অ্যাপ গ্রুপও হয়েছে। তুই কি ফেসবুকে আছিস?'

'না আমি কেবল ফেস টু ফেস দেখা করি। তবে আমার মেয়ে আমার ফোনে হোয়াটস্ অ্যাপ ডাউনলোড করে দিয়েছে। হোয়াটস্ অ্যাপ অ্যাকাউন্টস একটা আছে বটে, তবে...'

'আরে তাই তো, তোর কথা জানাই হলো না। তুই কী করছিস?'

'আমি স্কুলে পড়াচ্ছি। বারুইপুর রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়। এম-এ করেই তো বিয়ে পাশ করে ফেললাম।' বলেই মা হাসতে থাকেন।

'সত্যি এনসিয়ান্ট হিস্ট্রিতে তোর ধারেকাছে আমরা কেউ ছিলাম না।' এবার উনি সোপানের দিকে ফিরলেন, 'এইটি বুঝি তোর ছেলে?'

মায়ের ইঙ্গিতে সোপান ওনাকে নমস্কার করতে যাচ্ছিল। উনি ওকে ধরে ফেলে গাল টিপে আদর করলেন, 'না, না, এই ট্রেনের মধ্যে পায়ে হাত দিতে হবে না। সত্যি তুহিনা তুইও আছিস, এখনকার দিনে...'

মা শান্ত গলায় বললেন, 'কেন, এখন কি এমন সাহেবি যুগ এসেছে? ছোট থেকেই তো বড়দের সম্মান দিতে শিখবে।'

'বেশ বেশ! তা যাচ্ছিস কোথায় মা-বেটায়?'

'মামার বাড়ি। মানে আমার বাবার বাড়ি। অকালীপুর।'

'সেটা কোথায়?'

'রামপুরহাট থেকে যেতে হবে কয়েক কিলোমিটার। আমি দু'দিন থাকব। আমার স্কুল খুলে যাবে। সোপান দিন পনেরো থাকবে।'

রামপুরহাট স্টেশনে ছোট মামা ওদের নিতে এসেছিলেন। সঙ্গে তরুণ নামে এক বন্ধুকে নিয়ে। তরুণ মামার সঙ্গে কয়েক মিনিটেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল সোপানের। তরুণই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এমনিতে আকালীপুরে আসতে গেলে বাসে করে ভদ্রপুরে নামতে হয়। সেখান থেকে অটো করে পনেরো-কুড়ি মিনিট লাগে আসতে। তবে আজ তো ওরা সোজা গাড়িতে এলো। ওদের তাই সময় অনেক কম লাগল। ৪০ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল মামাবাড়ি।

গ্রামের একটা ছোট্ট নদী আছে, ব্রাহ্মণী। কী সুন্দর নাম। এখন গ্রীষ্মকাল তাই ব্রাহ্মণীর জল খুব কম। নদীর তীর থেকেই ঘন সবুজ রেখা গ্রামের ভেতরে চলে গেছে।

সোপানরা আসবে বলে বড় মামা, মেজ মামাও বাড়িতে আছেন। বড় মামার রামপুরহাট স্টেশন রোডের উপর আসবাবপত্রের দোকান। মেজমামা স্কুলে গণিত পড়ান। মেজমামার সুন্দর দাড়ি, দারুণ সৌম্য চেহারা। গলার স্বরও গম্ভীর, যেন টিভিতে কেউ খবর পড়ছে। বড়মামা একটু রোগা ভোগা। ধুতি আর ফতুয়া গায়ে একেবার সামনের দরজার এসে ওদের নিয়ে গেলেন। দাদুকে কে যেন খবর দিয়েছে, 'পুনপুনি এসে গেছে।'

পুনপুনি মায়ের ডাক নাম। এখন প্রায় কেউই বলে না। সোপানের শুনে খুব হাসি পায়। দাদুর বেশ বয়স হয়েছে। হাতে একটা সুদৃশ্য বেতের লাঠি। সোপানকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। 'দাদুভাই তো জেন্টলম্যান হয়ে গেছে, কী সুন্দর দেখতে হয়েছে রে পুনপুনি তোর ছেলেটা! চলো চলো দাদু ভেতরে চলো।'

মামিরাও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। মাকে নিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বলল, 'মায়ের শরীরটা ক'দিন ভালো যাচ্ছে না। আজও সকাল থেকে শুয়েই আছেন।'

'কেন কী হয়েছে মা'র? চলো তো দেখে আসি। ইস! আমাদেরই দোষ। কোনও খবরাখবরই রাখি না। ছিঃ ছিঃ!'

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সোপানও গেল দিদার ঘরে। গিয়ে তো ওরা অবাক, ওরা ঘরে ঢোকার আগেই দিদা হাতে একটা থালা নিয়ে বের হয়ে আসছেন। লালপাড় সাদা শাড়ি, মাথা ভর্তি সাদা ঘন চুল, মাঝখানে মোটা লাল সিঁদুর। পেছনে পেছনে একজন দিদি আসছিলেন। দুই মাসি তো দেখেই হা-হা করে উঠলেন। 'মা তুমি এসব কখন করলে, তুমি উঠলে কেন?'

দিদা সোপানের গালে একটু আদর করে বললেন, 'দাদুভাই আসছে আর আমি একটু ক্ষীরের নাড়ু করব না? তাছাড়া আমি তো কিছুই করি না, করেছে তো এই যশোদা। যশোদাই তো আমার সব।'

মা একটু উদ্বিগ্ন হয়েও বললেন, 'কিন্তু তোমার হয়েছে কী? ক'দিন নাকি উঠতে পারোনি, শুয়ে আছ?'

'আর বলিস না, হার্টের কী একটা হয়েছে। ডাক্তারই বলেছে ক'দিন একটু কম নড়াচড়া করতে। আরে বয়েসটা তো হলো। মানুষ তো আর অমর নয়, কোনও একটা কিছু তো হবেই। আজ তো বেশ ভালোই লাগছে।'

মেজমাসি তখন দিদাকে ধরে ফেলে বললেন, 'না, দাঁড়াও। তোমাকে কোথাও যেতে হবে না মা, আমরা সবাই এখানে আসছি। তুমি খাটে বস।'

দিদার দোতলার ঘরের সামনে একটা ঝোলানো বারান্দা। বারান্দাটাকে ছাতার মতো ঢেকে আছে একটা আমগাছ। হিমসাগর আমের গাছ। বড় বড় আম হয়ে আছে। ঝুলে পড়া ডালগুলো থেকে কী সুন্দর একটা গন্ধে ভরে আছে জায়গাটা। ওই বারান্দায় নীচের পুকুর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। সবাই দিদাকে ঘিরে বসল।

নিজের থেকে গ্লাসে গ্লাসে করে ঠাণ্ডা আমপানা এলো, ভাজা মৌরির মশলা দেওয়া আমপোড়া সরবত। তার আগেই দিদার তৈরি ক্ষীরের নাড়ু চার-পাঁচটা খেয়ে নিয়েছে সোপান। কী অপূর্ব স্বাদ সেই নাড়ুর, মুখে দিলেই যেন গলে যাচ্ছে। আর এক অনাবিল অনুভব। সত্যি, দিদার হাতে যাদু আছে।

মেজমামার দুই ছেলে, দুজনেই সোপানের থেকে ছোট। বড় ছেলে ঋক এবার ক্লাস এইটে উঠেছে, ছোট ছেলে ঋজিক এখন ক্লাস সিক্সে। বড় মামার একই মেয়ে টিপ, ভালো নাম দেবাদ্রিতা। টিপের এবার ক্লাস নাইন হলো।

টিপ দু-হাতে দুটো থালা নিয়ে ঢুকল। একটিতে সদ্য কাটা লাল তরমুজ, অন্যটাতে বেল আর চালকুমড়োর মোরব্বা। একেবারে জমে গেল আসর।

কীভাবে যে সময় কেটে যাচ্ছে! দিদার কী একটা কথা শুনে সবাই যখন হো-হো করে হাসছে, হঠাৎ ছোট মামা ঢুকে ছন্দপতন করল।

'কি গো দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হবে না? তরুণদা এসে গেছে। তরুণদা আজ খেয়ে তারাপুরে যাবে। ৪টে থেকে শাখা।'

সবার যেন সম্বিৎ ফিরল।

'হ্যাঁ গো সত্যি তো, গল্পে গল্পে কত বেলা হয়ে গেল। ও পুনপুনিদি, তুমি একটু স্নান করবে তো? এতোটা পথ ট্রেনে গাড়িতে এলে....'

'ঠিক বলেছ, আমি চট করে রেডি হয়ে আসছি! চল বুকাই স্নান করে নে।' মা আদর করে সোপানকে ওই নামে ডাকে। মা উঠে পড়েন। যেতে যেতে বলেন, 'আচ্ছা, ওই তরুণ ছেলেটা কে রে? এত সুন্দর ব্যবহার। আমি তো ভেবেছিলাম তোমাদের নতুন ড্রাইভার।'

বড় মামি বললো, 'না, না। তরুণ তো প্রচারক। আমাদের পুরনো ড্রাইভার হেমন্তদার ক'দিন ধরে জ্বর হয়েছে। তাই আজ তরুণ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে।'

মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'প্রচারক? কিসের প্রচারক?'

'আর এস এসের প্রচারক।' ছোট মামা বলেন।

'আর এস এস? সেটা কী রে?'

'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। পরে বলবক্ষণ বুঝিয়ে। এখন চলো তাড়াতাড়ি চিতল মাছের ঝোল ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বাবা আমাদেরই ঝোল বানিয়ে দেবে।'

ছোট মামার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। ঋজিক সোপানকে এসে বলল, 'চলো বুকাইদা তুমি আমাদের ঘরেই থাকবে। আমাদের ওখানে স্নান করবে।' বলেই কিছু বোঝার আগেই সোপানের কিটস্ ব্যাগটা কাঁধে তুলে চলল ওদের ঘরের দিকে।

আজকের দুপুরের খাওয়াটা সোপানের সারা জীবন মনে থাকবে। দাদুর বাড়ির নীচের তলায় লম্বা বারান্দা। চকচকে লাল মেঝে আর কালো বর্ডার। সবাই বসেছে একসঙ্গে। সেটাই দাদুর নির্দেশ। মেয়েরাও মুখ্য পদগুলো পরিবেশন করার পরে থালায় খাবার নিয়ে বসে পড়বে। বাকি পদ যে যার নিজে হাতে নিয়ে নেবে। শুধু খাবারের পাত্রটা চক্রাকারে ঘুরবে। আজকের মেনুতে ছিল যুক্তি ফুল ভাজা, পোস্তর বড়া, অড়হর ডাল, মোচার ঘণ্ট, চিতল মাছের পেটির পাতলা ঝোল আর কষা কষা চিতল মুইঠ্যা। তারপর রসনায় তৃপ্তি হেতু আমের চাটনি আর চিনি পাতা দই। সোপান চিতল মাছের মুইঠ্যা আগে খেয়েছে। মাও বানাতে পারেন। অদ্ভুতভাবে তৈরি হয়। পুরো কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যাল। মাছের পিঠের শক্ত দিকটা আলু দিয়ে মেখে মুঠো মুঠো করে ফুটন্ত জলের মধ্যে দিলেই শক্ত রবারের মতো হয়ে যাবে। অনেকটা দোকানের চিকেন সসেসের মতো। এটা নাকি পূর্ব বাংলার রেসিপি। আসলে মায়েরা ওপার বাংলার তো, তাই এসব খুব ভালোবাসে। করতেও পারে।

যেমন এপার বাংলার স্পেশাল পোস্ত। বড় মামিমা বাঁকুড়ার মেয়ে। পোস্ত, পেঁয়াজ আর নারকেল দিয়ে যে বড়াটা করেছিলেন তা এক কথায় অসাধারণ। সোপান দুটো খাওয়ার পরেও মনে হচ্ছিল আর একটা খায়। কিন্তু মা একবার চোখ বড় বড় করাতে আর বলার সাহস হলো না। তাছাড়া চিতল মাছের পেটির ঝোলের সুগন্ধে পরিবেশ ম-ম করছিল। তাই এগিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল।

সোপান লক্ষ্য করল তরুণ মামা যেন ইচ্ছে করেই ওর পাশে এসে বসল। সকাল থেকেই বেশ বন্ধুত্বের মতো হয়েছিল। একটা শ্যাওলা রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা পরেছে তরুণ মামা। একদম সাধারণ পোশাক আর শান্ত ব্যবহার। কিন্তু সোপান একটা মিষ্টি ব্যক্তিত্বের স্পর্শ অনুভব করল যেন। খেতে খেতে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করছিল সোপানকে। কোথায় থাকে, কোন ক্লাসে, কোন স্কুল, হবি কী? এইসব আর কী।

খেতে খেতে হঠাৎ মা বলে উঠলেন, 'সত্যি বৌদি, তোমাদের এখানে শুধু ভাত আর ডাল দিয়েই খাওয়া যায়। কী মিষ্টি ভাত গো!'

দিদা মিটি মিটি হাসছেন, 'আমরা তো এখনও ঢেঁকিছাঁটা চালই খাই। আর সত্যি বলতে কী, এর জন্য বৌমাদেরই ভালো বলতে হবে। ভাতটা মাটির হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে করে আসছে। সত্যি এমন দুটো বউমা পেয়ে আমার গর্ব হয়।'

মেজ মামিমা ফোড়ন কাটেন, 'ভালোও হয় খিড়কি পুকুরের জলে।'

মা-র হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল, 'আচ্ছা মা, তোমার তো তিনটে বউমা পাওয়ার কথা। ছোটটার বিয়ে কবে দেবে। ওর প্র্যাকটিসও তো ভালোই জমে উঠেছে।

শুনে তরুণমামা যেন বল পেয়ে গেল। খুব উৎসাহ নিয়ে বলল, 'একদম ঠিক দিদিভাই। আপনি এবার আপনার এই থাকার মধ্যেই ডাক্তারের বিয়ে দিয়ে যান। নাহলে বেচারার গতি হচ্ছে না।'

ছোটমামা লজ্জা পেয়ে যায়, 'তরুণদা আমার সর্বনাশ করা ছাড়া তোমার আর কোনও কাজ নেই, না? ছাড়ো না।'

তরুণদা জল গড়ানো হাসি হাসছে, 'আছে, আরও অনেক কাজ। তবে আপাতত কাজ ডাক্তারের একটা ভালো কম্পাউন্ডারের ব্যবস্থা করা।'

খেতে খেতে সব্বাই হেসে উঠল। টিপ চাটনির আমের আঁটির টুকরো চুষতে চুষতে বলল, 'কাকাইয়ের বিয়েটা এবছরই দিতে হবে। নাহলে তিন বছর পরে।'

সবাই একেবারে চুপ। কী অদ্ভুত কথা! এবছর না হলে তিন বছর পরে কেন?

তরুণদাই রহস্য ভাঙল, 'আরে বুঝতে পারছ না, ম্যাডামের আগামী বছর মাধ্যমিক, তারপর উচ্চমাধ্যমিক। ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে না?'

টিপ প্রতিবাদ করে, 'তরুণকাকু ভালো হবে না কিন্তু। তোমাকে বিশ্বাস করে বললাম আর তুমি এরকম বিট্রে করলে?'

আবার একটা হাসির রোল। হাসি একটু থামতেই মা বলে উঠলেন, 'তরুণের পড়াশুনা কোথা থেকে?'

'আমি উত্তরবঙ্গের ছেলে, গ্র্যাজুয়েশন কোচবিহার বি. এন. শীল কলেজ থেকে। তারপর মাস্টার্স করলাম যাদবপুর

NAVYUG®
BSCIC
IS : 2494
CM/L NO. 9065679
VINÇOTTE
ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
B0089/0104:0807
MANUFACTURERS & EXPORTERS OF:
V, COGGED & POLY BELTS
FOR INDUSTRIAL & AUTOMOTIVE APPLICATION
QUALITY SPEAKS ITSELF
Recognised Export House by Govt. of India
NAVYUG (INDIA) LIMITED
G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009
Ph.: 0181-2420551-552-053-054 Fax : 0181-2420553
E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com

®
BRAND
MARKED
HIGH GRADE
MALLEABLE IRON
HOT GALVANISED
PIPE FITTINGS
MFD. BY.
Ph. : 260-1548/1566 R-256305, 257593.
CRESCENT ENGG. CORP.
G. T. ROAD, BYE PASS, JALANDHAR

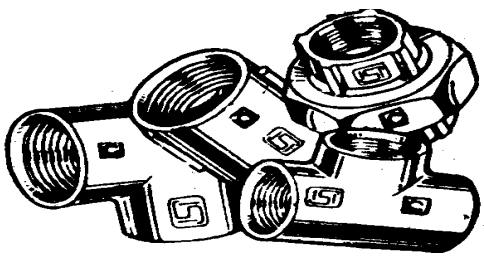

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।'

'বাঃ! তোমার বিষয় কী ছিল?'

'ফিজিক্স।' এবার তরুণমামা একবার ঘড়ি দেখে বলল, 'দিদি আমি উঠে পড়লাম। একটু দূরে যেতে হবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগবে।'

সকলেই এক এক করে উঠে হাত ধুতে চলে গেল। তরুণমামার বাইক পুকুরের ধারে রাখা ছিল। দাদুর বাড়ির পুকুরের পাড়টা একেবারে দেখার মতো। দাদু নিজে হাতে বেছে বেছে ফুলের গাছ লাগিয়েছেন। তাই সারা বছরই পুকুরের চারদিকে কোনও না কোনও ফুল ফুটে থাকে। মাটিতে ছড়িয়ে থাকে। বাঁধানো ঘাটের দুদিকেই গন্ধরাজ, জুঁই, কুন্দ, মাধবীলতা আর কামিনী গাছ। তাই বাঁধানো ঘাটে বসলে ফুলের গন্ধে মন ভরে যায়। পুকুরের ধারে বড় বড় ফুলের গাছ। এখন গ্রীষ্মের ফুল জারুল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া আলো হয়ে আছে। পূর্বদিকে সব বর্ষাঋতুর ফুলের গাছ। অমলতাস, শিরিষ আর চাঁপা গাছের বন। পশ্চিমদিকে শরৎকালে পুকুরপাড় শিউলি ফুলের আলপনা হয়ে থাকে ঘাসের উপর। শীতের ফুলের গাছ অনেক যত্ন করে যোগাড় করে এনেছিলেন দাদু। ম্যাগলোনিয়া, লাল ফুলে ভরা পালসেটিলা আর ছাতিম। দক্ষিণ দিকে বসন্তের গাছ। সেদিকেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যা। গাছ বাড়তে বাড়তে দক্ষিণ থেকে পূর্ব দিকে, পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে গেছে। কী গাছ নেই, বসন্তের রক্তপলাস, শিমুল, বনপলাশ, হলুদ পলাশ, অশোক— সব গাছ একটা দুটো করে লাগিয়েছে দাদু। পুকুরের ঘাটে জামগাছের নীচে দাঁড়িয়ে এইসব খুব উৎসাহ নিয়ে বলছিল ছোটমামা। তরুণমামা বাইকের উপর বসে সব শুনছিল।

উপরের দিকে তাকিয়ে তরুণদা বলল, 'কিন্তু গাছে জাম পেকে কালো হয়ে আছে। পাড়ছো না কেন ডাক্তার? আর ফল পড়ে ঘাটটাও নোংরা হয়ে যাচ্ছে।'

ছোট মামাও উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক কথা। কিন্তু পাড়ার লোক পাওয়াই মুশকিল। দেখি...'

তরুণমামা মোটরবাইক স্টার্ট দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, কাল রামপুরহাট থেকে এক চ্যাংড়াকে নিয়ে আসব পাড়ার জন্য। কাল সকালে শাখার পরে জামোৎসব হবে।'

সোপানরা প্রায় একযোগেই বলে উঠল, 'চ্যাংড়া? চ্যাংড়াটা কে?'

তরুণমামা জিব কেটে বলল, 'ও হো! এটা আমাদের কোচবিহারের ভাষা। কাল সকালে জাম পাড়ার জন্য একজন ছেলেকে নিয়ে আসব। চ্যাংড়া মানে ছেলে। আজ আসি রে, রাজকন্যা রাজপুত্ররা। ডাক্তারেরও চেম্বারের সময় হয়ে গেল।'

বলেই তরুণমামা মোটকবাইকের কান পাকিয়ে চলে গেল। তারপর ব্রাহ্মণী নদীর উপরের লোহার পুল পার করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তরুণমামা চলে যাওয়ার পর সোপান একটু শুয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা অনেকটা গড়িয়ে গেছে। চোখেমুখে জল দিয়ে বেরিয়ে দেখল, টিপ চা তৈরি করছে বড়দের জন্য। 'ছোটমামা কোথায়?' সোপান প্রশ্ন করে।

'কাকাই তো চেম্বারে চলে গেছে। ভদ্রপুর বাজারে চেম্বার। ৪টের মধ্যে পৌঁছে যায়। তুমি চা খাবে?'

'চা! খেতে পারি, কিন্তু ঋক আর ঋজিক কোথায়?'

টিপ কাপে কাপে চা ঢালছে। চা ঢালতে ঢালতে বলল, 'ওরা তো শাখায় গেছে। ওই তো সামনে মাঠে।'

'শাখা? সেটা আবার কী?'

'শাখা, সঙ্ঘের শাখা।' বলেই টিপ বুঝল সোপান বুঝবে না, ওই তো শিবের দালানের সামনে হচ্ছে। যাও না গিয়ে দেখ না।'

সোপান জানলা দিয়ে একটু উঁচু হয়ে দেখল, ছেলেরা মাঠে জড়ো হয়েছে। 'আমি চা খাব না', বলে তাড়াতাড়ি করে দোতলার বারান্দা হয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে টুক টুক করে চলে এল মাঠে। গিয়ে দেখল, মাঠে একটা লাঠির মাথায় একটা পতাকা লাগানো আছে, আর ছেলেরা তার সামনে খেলা করছে। ঋক হাতে একটা ছোট হুইসিল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর ছেলেরা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে কী যেন একটা খেলছে।

একদিকের ছেলেরা বলছে— 'হাতি ঘোড়া পাল কী'

অন্যদিকের দল আরও জোরে চেঁচিয়ে বলল, 'জয় কানাইয়া লাল কী'।

'হাতি ঘোড়া পাল কী / জয় কানাইয়া লাল কী' বলেই খেলা শুরু হলো।

দুটো দলের মাঝখানে একটা রেখা। সেই রেখার উপর রাখা আছে একটা লাল রঙের বল। দুই দলের একজন একজন করে ডাকছে। আর তারা ছুটে এসে বলটা নিয়ে কে আগে নিজের স্থানে ফিরতে পারবে। এরপরে আরও দুটো খেলা হলো। সোপানের দেখে অবাক লাগল, এতটুকু ঋক কেমন এতজন ছেলেকে খেলাচ্ছে। তার মধ্যে চার-পাঁচজন তো ওর থেকেও বেশ বড়। ওরা সবাইকে দুটো ভাগ করে দাঁড় করাল। হঠাৎ ওর চোখ গেল সোপানের দিকে। ও ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদাভাই তুমি কবাডি খেলবে?'

কবাডি স্কুলে দু-একবার খেলেছে বটে সোপান, তবে ফুটবল বা ক্রিকেটের মতো কখনোই খেলেনি। তবু রাজি হয়ে গেল সোপান। সোপান সরাসরি খেলার দলে যোগ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঋক এসে বাধা দিল, 'দাদা তোমাকে ধ্বজপ্রণাম

করতে হবে।'

তারপর ওই গৈরিক পতাকাটির সামনে এসে এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে বুকে হাত দিয়ে এক-দুই-তিন বলে ধ্বজপ্রমাণ করল। তারপর খেলতে নিয়ে এল। এই মজার আচরণে সোপানের একটু হাসিই পেল।

আজ কবাডি খেলে সোপানের ভীষণ আনন্দ হলো। প্রায় পনেরো মিনিট খেলে। একেবার ঘেমে নেয়ে সবাই এক জায়গায় গোল হয়ে বসল। সবাই নিজের নিজের পরিচয় বলল একবার করে। কলেজে পড়াশুনা করে একজন দাদাও সঙ্গে ছিল। পরিচয়ের পরে সকলে মিলে গাইল, 'ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো।' পরিবেশটা ভীষণ সুন্দর হয়ে উঠল। একটি বাচ্চা ছেলে কী সুন্দর একটা সংস্কৃত শ্লোক বলল, তারপর তার মানে বলল, আবার ওই শ্লোকটি আবৃত্তি করল। ওই কলেজে পড়া দাদাটার নাম সৌম। সৌমদা এরপর ক্ষুদিরাম বসুর জীবনের উপর সুন্দর কাহিনি বললেন। শুনে সোপানের চোখও কেমন ছলছল করে উঠল। এবার সকলকে ওঠার জন্য কী একটা কম্যান্ড দিল ঋক। ছোট বড় সকলে একসঙ্গে উঠে পড়ল ওই ছোট্ট ঋকের কম্যান্ড শুনে। সবাই একটা বিশেষ ভঙ্গিতে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। একটা হুইসিলের সিটির সঙ্গে পিছন থেকে এসে কয়েকটা সারি দিয়ে দাঁড়াল সেই গৈরিক পতাকার সামনে। এবার সোপানের বেশ মজাই লাগল। এরপরেই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল। একটা ছোট্ট সিটির সঙ্গে সঙ্গে সকলে বুকে হাত দিয়ে একটা সুরেলা ভঙ্গিতে প্রার্থনা করল। সোপান ক্লাস সেভেন আর এইটে সংস্কৃত পড়েছিল। সংস্কৃত প্রার্থনার মানে সামান্যই বুঝতে পারল। তবে সেটা যে দেশমায়ের প্রতি প্রার্থনা এইটুকু পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল। সে। শাখা শেষ হবার পরে আবার ছোট ছেলেরা চেঁচিয়ে বলতে লাগল—

'হাতি ঘোড়া পাল কী
জয় কানাইয়া লাল কী।'

বলতে বলতে গ্রামের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সোপান দেখল ঋক সেই ে গোরুয়া পতাকাটা ভাঁজ করে একটা ে গোরুয়া রঙের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে, পতাকার লাঠিটা ডান বগলে নিয়ে তার দিকেই আসছে। 'বুকাইদা কেমন লাগল আমাদের শাখা?'

'কী, কী নাম বলিস তোরা এটাকে?'

'শাখা, সঙ্ঘের শাখা।'

তারপর ঋক বলতে থাকল কী হয় শাখায়। কীভাবে শারীরিক প্রশিক্ষণ হয়। কত কত গান শেখে। সংস্কৃত শ্লোক, যাকে শাখার ভাষায় বলে সুভাষিত। দাদা এত কিছু বলে ফেলল, ঋজিক কিছুই বলতে পারছে না। ও এবার উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমি তেরোটা সূর্য নমস্কার করতে পারি বুকাই দা। কাল দেখাব তোমাকে।'

বাড়িতে এসে দেখল, বড় মামি তুলসীতলায় প্রদীপ দিচ্ছেন। ওরা তিনজন ভালো করে হাত-পা ধুয়ে ঢুকল। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে নিল সোপান। ঘরে এসে দেখে ঋক আর ঋজিক স্বামী বিবেকানন্দর বড় ছবিটার সামনে চুপচাপ বসে আছে। মেরুদণ্ড সোজা করে হাতদুটো সোজা করে বসে আছে। ধ্যান করছে। সোপান কী একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘরের পরিবেশ দেখে আর কোনও কথা বলতে ইচ্ছা করল না। ও কিছু না বলে ওদের পেছনে বসে পড়ল। মেরুদণ্ড সোজা করে বসল, ওদের মতো করে হাতের মুদ্রা করে একবার বিবেকানন্দের ছবির দিকে তাকাল। তারপর চোখ বন্ধ করে শান্ত হয়ে বসল।

পড়ার টেবিলে গিয়ে দেখে দেবাদ্রিতাও এসে বই খুলে বসে গেছে। ঋক আর ঋজিকও বইয়ের ব্যাগ নিয়ে বসল।

মেজমামি বললেন, 'সোপান তুমিও বোসো টেবিলে। এখানেই সন্ধ্যার খাবার দিয়ে দেব। বলতে বলতেই চলে এল চার বাটি মুড়ি। একেবারে বড় জামবাটি ভরা ঘরে ভাজা একটু লালচে মুড়ি। সেই সঙ্গে একটা বাটিতে বাদামভাজা, একটা বাটিতে কয়েক টুকরো মিছরি আর একটা থালায় লম্বা লম্বা করে কাটা শশা। বহুদিন পরে এত সুন্দর সন্ধ্যার জলখাবার খেল। বড় মামি এরপর দিয়ে গেলেন চার গ্লাস ভর্তি গরমাগরম দুধ।

সোপান সাধারণত কলকাতায় দুধ খায় না। ও বলল, 'মামি আমি দুধ খাব না।'

মামি হেসে বললেন, 'এ আমাদের বাড়ির গোরুর দুধ। খেয়ে দেখ, ভালো লাগবে।'

তবু সোপানের দ্বিধা, 'আমার কেমন গন্ধ লাগে দুধে।'

'লাগবে না, লাগবে না। খেয়ে নাও।' বলেই মামি রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

ততক্ষণে তিন ভাই-বোন দুধে চুমুক দিয়ে দিয়েছে। রিজিকের ঠোঁটের উপর দুধের গোঁফ হয়ে গেছে। দেখে হেসে ফেলল সোপান। সোপান একটু গন্ধ শুঁকে নিয়ে এক চুমুক দিল। বাঃ, দারুণ খেতে তো! দু-তিন বার দুধ খেয়ে সোপান যেন ভেতর থেকে বলে উঠল, 'কী ভাল খেতে। আমি তো ভাবতেই পারিনি।'

ঋজিক হাততালি দিয়ে উঠল, 'আমাদের সোনালি গাইয়ের দুধ, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো দুধ।'

'তোমাদের ক'টা গোরু আছে?'

ঋজিক আর কাউকে বলতে দেবে না। ও বলে চলে,

'সাতটা। তার মধ্যে আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসে সোনালি গৌ।'

দেবাদ্রিতা নাইনে ওঠার পরে একটু সিরিয়াস হয়ে গেছে, এত কথার মধ্যেই ও বই খাতা খুলে অঙ্ক শুরু করে দিয়েছে।

'সোপানদা তোমারও তো মেকানিক্স ছিল। এই অঙ্কগুলো একটু দেখবে?'

দু-তিন মিনিটের মধ্যেই তিন ভাই-বোনের টেবিলে একেবারে পিন পড়ার শব্দ না হওয়ার মতো নিস্তব্ধতা। একটু পরে ঋজিক কী একটা কবিতা মুখস্থ করার জন্য একটা গুনগুন শুধু শোনা গেল।

আজ সন্ধ্যায় সোপানের মাথাটাও যেন সুপার কম্পিউটারের মতো কাজ করছিল। একটার পর একটা মেকানিক্সের প্রব্লেম, যেগুলো টিপের আটকে গিয়েছিল, ঝপঝপ করে করে ফেলল। এত ভালো অঙ্ক করে সোপানের নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

দেবাদ্রিতা তো খুশিতে ডগমগ, 'ইস্ট হো ইয়া ওয়েস্ট, সোপানদা ইজ দ্য বেস্ট।'

এর মধ্যেই মেজমামি ঘরে ঢুকলেন। 'চলো চলো খেতে চলো। সব্বাই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

ঋজিক উঠে গিয়ে মায়ের আঁচল ধরে বলল, 'মা, সেইটা কি হয়েছে আজকে?'

মেজমামি একটু হেসে রহস্য করে বললেন, 'চলো দেখি, তোমার আইটেম রেসিপি হয়েছে কিনা!'

টিপ, সোপান, ঋক, ঋজিক এসে দেখল সবাই দাদুকে মাঝখানে রেখে দুপুরের মতো বসেছে। মাঝখানে রাখা সব খাবার। ভাত, রুটি, তরকারি, শশা, পেঁয়াজ, লঙ্কা কাটা। ঋজিক লাল মেঝেতে পা দিয়েই একবার এগিয়ে এসে দেখে নিল বড় গামলাতে কী রাখা আছে। তারপর মেজমামিকে জড়িয়ে খানিকটা নেচে নিল, 'আমার মা, সোনা মাটা, আমার মাম মামটা! জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সীটা!'

মেজমামি ওর হাত ছাড়িয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজ বায়না করেছ, আর সোপান দাদা এসেছে তাই করা হয়েছে। কাল আবার কিছু বায়না করলে কাঁচকলা খাবে।'

ঋজিক পাঁঠার মাংস খেতে খুব ভালবাসে। কিন্তু এবাড়িতে পাঁঠার মাংসের একটু বিশেষ ব্যবস্থা লাগে। মা কালীর সামনে এক কোপে বলি দেওয়া মাংস ছাড়া নাকি খাওয়া উচিত নয়। দাদু বলেন, 'এক কোপে কাটা মাংস ছাড়া অন্য মাংসকে বলে 'বুথা মাংস', তা খেলে শরীর মনের ক্ষতি হয়। ছোট মামার চেম্বারের কাছেই একটা দোকান আছে, 'মা তারা মিট শপ'। কার্তিক ঘোষ না কার একটা দোকান। ওখানে সকাল সন্ধ্যা মা কালীর পুজো দেয় পুরোহিত। আজ মেজমামি ফোন করাতে ছোট মামা একটি ছেলেকে দিয়ে মাংস কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তবে দাদু, দিদা আর বড় মামা মাংস খাবেন না। তাদের জন্য ছানার ডালনা করা হয়েছে। বড় মামা যোগাসনের দিকে ঝোঁকার পর থেকে একটু একটু করে আমিষ ছাড়ছেন। সেই নিয়ে বড়মামির সঙ্গে একটু আধটু রাগারাগিও হয়েছে। তবে বড়মামা ইলিশ মাছটা এখনও ছাড়তে পারেনি। আগে বড়মামা বলতেন, 'ইলিশ মাছ নষ্ট করা একটা সামাজিক অপরাধ।' তবে যোগাসনে মগ্ন হওয়ার পরে ওসব আর বলেন না।

মাকে এত খুশি বহুদিন দেখেনি সোপান। আজ সারাদিন অনেকবার মনে হয়েছে মা যেন ছোট্ট মেয়ে হয়ে গেছে। এখন ইচ্ছে করেই যেন সোপানকে একটু ধাক্কা দিয়ে বসলেন মা, সোপান একটু অবাক চোখে তাকাতেই মা চোখে ইঙ্গিত করলেন মাংসের পাত্রের দিকে। চোখের ভাষায় বললেন, কি বুকাইবাবু? মটন তো তোমারও খুব প্রিয়!'

সোপান যেন একটু লজ্জা পেল, মা সেটা বুঝতে পেরে কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য বললেন, 'আচ্ছা বড়বৌদি, তোমরা দুপুরে রাত্রে সকলে একসঙ্গে খেতে বস?'

'না, না। দুপুরে তো তোমার দাদারা থাকে না। তাই সংসার ঠেলে যার যখন সময় হয় খেয়ে নিই। তবে, এই রাত্রের খাওয়া সবাই একসঙ্গে খাই। এই একটা সময়ই তো বাড়ির সকলে একসঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ পায়।'

খাওয়া শুরু হল। সোপান মাংস, রুটি আর স্যালাড নিল। মাংসটা এককথায় অসাধারণ হয়েছে।

দিদা একদম গরম-গরম রুটি পছন্দ করেন। তাই যশোদা দিদি একবার একটা হাতেগরম রুটি দিয়ে গেল। দাদু দিদার সঙ্গে একটু দুষ্টুমি করে বললেন, 'পুনপুনি তোর মা'র এই দুটোই বিলাসিতা। হাতে গরম রুটি, আর আমার উপর গরম গরম ভাষণ।'

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। দিদা প্রথমে একটু রাগ করতে গিয়ে নিজেই হেসে ফেলেন।

খেতে বসে যে এত আনন্দ হতে পারে, আর বয়সে বড়, বয়সে ছোট সবাই মিলে হাসি মজা করা যায় দেখে সোপান

smc
Moneywise. Be wise.

SMC WISHES YOU A
HAPPY DURGA PUJA

Call Toll-Free
1800 11 0909
www. smctradeonline.com

Broking - Equity, Commodity & Currency | Wealth Management | Insurance Broking | Real Estate Advisory | Mortgage Advisory | Distribution of IPOs, Mutual Funds, FDs & Bonds | Investment Banking | NBFC Financing | PMS | Institutional Broking | Clearing Services | NRI & FPI Services | Research

DELHI | MUMBAI | KOLKATA | AHMEDABAD | CHENNAI | BENGALURU | DUBAI

SMC Global Securities Ltd., CIN No.: L74899DL1994PLC063609 | REGISTERED OFFICE: 11/6-B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel +91-11-30111000 | SMC Comtrade Ltd., CIN : U67120DL1997PLC188881

NSE INB/INF/INE 230771431, BSE INB/INF 011343937, MSEI INB/INF 260771432 INE 260771431, CDSL/NSDL-IN-DP-130-2015 (SMC Global Securities Ltd.), NCDEX/MCX (8200)/NMCE/ICEX-INZ000035839 (SMC Comtrade Ltd.), PMS INP000003435 (SMC Investments and Advisors Ltd.) IRDAI Regi: No: DB 272/04 License No. 289, Valid upto 27/01/2020 (SMC Insurance Brokers Pvt. Ltd.), Merchant Banker INM000011427 (SMC Capitals Ltd.)

Investment in securities market are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing

Follow us on

পুরো মোহিত হয়ে গেছে। নিজেদের বাড়ির মধ্যে এত আনন্দ লুকিয়ে থাকে!

দুই মামি সবাইকে নিয়ে বসে পড়েছেন। দিদা জোর করে যশোদা দিদিকেও বসিয়ে দিলেন খেতে।

কথায় কথায় মেজমামা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল তোর কী প্ল্যান পুনপুনিদি?'

'কাল ভাবছি সকালে একবার আকালী মায়ের মন্দিরে যাব।' বলেই একবার বড়মামার দিকেও তাকালেন, 'তবে তোমরা যদি অন্য কিছু বলে তো...'

বড়মামা বললেন, 'সে তো ভালো কথা! তা মায়ের কাছে যেতে যখন মন করেছে যা না কাল সকালে। তবে খুব সকাল সকাল যেতে হবে। গ্রীষ্মকালে পুজো একটু তাড়াতাড়ি হয়।'

মা সোপানকে বললেন, 'চল, কাল সকালে মায়ের পুজো দিয়ে আসি। এখানের খুব জাগ্রত দেবী।'

মেজমামা যোগ করলেন, 'ঠিক! এই মন্দির বানিয়েছিলেন মহারাজ নন্দকুমার। উনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই ব্রাহ্মণী নদীর ধারে বানিয়েছিলেন।'

'মহারাজ নন্দকুমার নামটা খুব চেনা চেনা লাগছে।'

মা শুনেই একেবারে ধমকে উঠলেন, 'কিরে তুই মহারাজ নন্দকুমারের নাম মনে করতে পারছিস না? ছিঃ ছিঃ, কি রে তুই?'

মেজমামা মাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দিদি, এটা এদের কোনও দোষ নেই। আমাদের দেশের ইতিহাসটাই এমনভাবে পড়ানো হয় যে দেশপ্রেমিক মনীষীদের কথা জানতেই পারছে না।'

মহারাজ নন্দকুমারের এই ভদ্রপুরেই জন্ম। উনি কালেক্টর ছিলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য রাজার ফাঁসির আদেশ হয়েছিল হেস্টিংসের ষড়যন্ত্রে। লন্ডনের কোর্টে নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ রদ হয়েছিল। কিন্তু জাহাজে করে আসতে আসতে কোম্পানি রাজা নন্দকুমারের ফাঁসি দিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। সেই রাজা এই মন্দির বানিয়েছিলেন এক রাত্রের মধ্যে। তাই মন্দিরের চূড়া আর ছাদ সম্পূর্ণ হয়নি।

মেজমামার কথা শেষ হতেই মেজমামি যোগ করলেন, 'মজার বিষয় হলো, এই মন্দিরের বিগ্রহের সঙ্গে মহাভারতের যোগ করে দেবীর নাম গুহ্যকালী। ইনি বীর জরাসন্ধের উপাস্য দেবী ছিলেন। এখানকার পূজাপদ্ধতিও ভিন্ন।'

ছোট মামা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার খানিকটা আপনমনেই বললেন, 'সত্যি আমাদের দেশের কোণায় কোণায় কত বিস্ময়, কত রহস্য জড়িয়ে আছে।'

ঠিক হলো কাল ভোর ভোর ওরা মা আকালী মন্দিরে যাবে পুজো দিতে। মেজমামা, ছোটমামা দুজনেই যাবেন। মেজমামি পুজোর যোগাড় সকালেই করে নিয়ে যাবেন মাকে নিয়ে।

রাতে শোয়ার সময় উপরের ঘরের থেকে একটা কী যে ফুলের সুন্দর গন্ধ আসছিল। নীচে পুকুরের থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া মাঝেমাঝেই ওই ফুলের সুগন্ধ বয়ে নিয়ে আসছিল। গন্ধটা কোন ফুলের?'

ঋক বলল, 'হাসনুহানা। ছোট কাকাই এই গাছ লাগিয়েছে গতবছর। দারুণ না গন্ধটা?'

খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আসছিল। নারকেল পাতা আর সুপারি পাতার ছায়া চাঁদের আলোয় বিছানায় কাঁপছে। হাসনুহানার গন্ধে কখন ঘুম এসে গেল।

আকালী মায়ের মন্দির যেতে যেতে ৬টা বেজে গেল। ব্রাহ্মণী নদীর ধারে মন্দির পরিসরটা একেবারে হাতে আঁকা ছবির মতো। গ্রীষ্মের নদী একেবারে ক্ষীণ হয়ে গেছে, ঘন সবুজ ঘাসের গালিচা একেবারে নীচ থেকে মন্দিরের ঘাট পর্যন্ত উঠে এসেছে। মন্দিরের নির্মাণ যে অসম্পূর্ণ তা এখনও দেখে বোঝা যায়। দেবীর আদেশ ছিল এক রাত্রের মধ্যে মন্দির সম্পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু চূড়ার অংশ নির্মাণকর্মীরা রাতের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারেনি। তাই অসম্পূর্ণই থেকে যায়। কিন্তু মন্দিরের চবুতরাতে বসলে একটা অপার্থিব শান্তি। ধুনো, চন্দন আর ফুলের গন্ধ একটা পবিত্র পরিবেশ, দূরে সকালের নরম আলোতে স্নান করা আমবাগান। মা আর মেজমামি লালপাড় সাদা শাড়িতে এসেছেন, মা একটা শাড়ি এনেছিলেন কলকাতা থেকে মা আকালীকে পুজো দেবেন বলে। তার সঙ্গে পাঁচরকম ফল, আলতা, সিঁদুর, শাখা-পলা, নোয়া সবই আনিয়েছেন ছোটমামাকে দিয়ে। মামি সুন্দর করে ফল, মিষ্টি, ধূপ দীপ দিয়ে ডালা সাজিয়েছেন। পুজো শুরু হলো। সকালের পুজোতে খুবই কম যাত্রী থাকে। তাই ফাঁকায় ফাঁকায় মনের মতো করে পূজো করতে পারলেন মায়েরা। পুজোর শেষে চরণামৃত আর কাটা ফল, সন্দেশ প্রসাদ নিয়ে সোপানরা মন্দির থেকে বের হলো। সকালে শোভা সর্বত্র। গ্রামের নিত্য জীবনও শুরু হচ্ছে। চাষের ক্ষেতে যারা যাওয়ার, তারা ইতিমধ্যে মাঠে নেমে গেছেন। শুধু দু-একজন রাখাল গোরু নিয়ে মাঠে যাচ্ছে। যাঁরা শহরে কাজে

যাবেন তারাও বেরিয়ে পড়েছেন বাস ধরার জন্য।

পায়ে পায়ে ওরা মামাবাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল। দূর থেকে সোপান শুনতে পেল ঋজিক চিৎকার করছে, 'দাদা এদিকে এসো, আমাদের গোশালা দেখে যাও।'

মেজমামা হেসে বললেন, 'সত্যি দর্শনীয়ই বটে, দাদা একটা বড়সড় গোয়ালঘর বানিয়েছে। ছ-সাতটা গোরু এনে একেবারে পুরোদস্তুর গোশালা।'

সোপান দু-একটা গোয়াল কখনো সখনো দেখেছে বটে। তবে এটার চেহারা একেবারে আলাদা। ভেতরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দু-তিনটি জায়গার উপর থেকে মশারি ঝোলানো। গোরুর সঙ্গে দু-তিনটা বাছুরও নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা গোয়ালে ঢুকেই বললেন, 'ওমা, বড়দা তোমার গোরুর দুধ তো বাছুরগুলোই নেচে নেচে খেয়ে নিচ্ছে। তোমার গোরু পুষে কী লাভ হচ্ছে!'

বড়মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না, একেবারেই নয়। আমার গোরু অ্যাভারেজের থেকে বেশি দুধ দেয়। সকালে ওদের নিজেদের বাচ্চাদের খাওয়াতে পারলে ওরা সারাদিন খুশি খুশি থাকে, তাই দুধও বেশি দেয়।'

ঋজিক লাফাতে লাফাতে এসে বলল, 'দেখবে পিসিমণি, সোনালী গৌ আমাকে কেমন ভালোবাসে!'

বলেই ঘিয়ে রংয়ের গোরুটার কাছে এসে ওর গলকম্বলে হাত দিল। ঋজিকের সোনালি গৌ ঘাস আর বিচালির জাবনা খাচ্ছিল, ঋজিকের স্পর্শ পেয়ে খাওয়া ছেড়ে ফিরে তাকালো। তারপর জিভ দিয়ে ঋজিকের হাত, কান, গলা চেটে চেটে আদর করতে লাগল।

সোনালি গৌ আর ঋজিকের এই কাণ্ড দেখে সবাই হেসে উঠল, বড়মামা বাইরের থেকে ডেকে বললেন, 'একটা জিনিস দেখে যা।'

গোশালার পেছনে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। গোয়ালের ধোয়ানো জল, যেখান থেকে গোবর, গোমূত্র জলের সঙ্গে আসে এই জমিটাতে, সেখানে একটা বড় জায়গাতে একেবারে হরেকরকম সবজির চাষ হয়েছে। ঢ্যাঁড়স, ঝিঙে, পটোল, কুমড়ো, পুঁই শাক আর নটে শাক— এক একটা চারকোণা জায়গায় এক এক সবজির। লঙ্কার দু-তিন রকম প্রজাতির গাছ সারি সারি হয়ে আছে। ছোট্ট ছোট্ট বেগুনগাছগুলোকে বাঁশের কঞ্চি কেটে বেড়া দেওয়া আছে। ছোটমামাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল। বলল, 'এখানে কোনও কীটনাশক দেওয়া হয় না। বড়দা গোমূত্র আর নিমপাতা ফুটিয়ে একটা পাচন বানিয়েছিল। প্রথমে আমরা খুব হেসেছিলাম। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ওটা গাছে দেওয়ার পরে গত কয়েকমাস ধরে মাজরা পোকা বা ল্যাদা পোকা হয়নি। সত্যি মিরাকেল।'

বড়মামা খুব উৎসাহ নিয়ে বোঝাতে থাকেন, 'আরে আমি তো পোকাদের দিয়েও খাটিয়ে নি।'

'সেটা কিরকম ভাবে মামা?' সোপানও ধীরে ধীরে আকর্ষণ অনুভব করছে।

'দেখ আমরা গোবরটা জল দিয়ে গুলে যখন মাটিতে দিই, তার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কেঁচোরা সেই খাবার খেয়ে এক অপূর্ব সার-ভার্মি কম্পোট তৈরি করে।'

মামা তৈরি কম্পোস্ট পিট আর বীজতলা দেখাতে লাগলেন। ভীম নামে একজন দাদা ওই ভার্মি কম্পোস্ট নিয়ে বেগুনক্ষেতে দিতে যাচ্ছে।

'তুমি কী একটা প্ল্যান্ট বসাবে বলছিলে দাদা, সেই প্ল্যান কি আছে এখনও?' ছোট মামা পিছনে থেকে বলে।

'আলবত আছে। আমি ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে চিঠিও লিখেছি। ছোট একটা প্ল্যান্টের কত দাম তার কোটেশন দিতে বলেছি।'

'ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার মানে পরমাণু শক্তি দপ্তরের? ওরা গোবর দিয়ে কী বানায়? এ বাবা! কী বলছ গো!'

ছোটমামা উত্তরটা দিলেন, 'এখন বড় বড় গবেষণা সংস্থা বিজ্ঞানকে মানুষের প্রয়োজনের জন্য পৌছানোর চেষ্টা করছে। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনও এমন অনেক টেকনোলজি ট্রান্সফারের প্রকল্প করছে।'

'ঠিকই বলেছিস। বি এ আর সি বা বার্কের একটা ইউনিট আছে 'আকৃতি' বলে। ওরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির একটা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বানিয়েছে। আমাদের যা গোধন আছে, তার থেকে যে গোবর গ্যাস পাওয়া যাবে, তাতে আমাদের বাড়ির রান্না হয়ে যাবে। আর ওই গ্যাস বের করার পর তার থেকে গোবর সার ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি হবে।'

মা খুব মন দিয়ে শুনছিলেন, 'সেকি গো, এতসব কিছু আছে? আচ্ছা দাদা, তুমি ওই বড় গোরু তো একটাও রাখোনি। কী জার্সি কাউ না কী বলে! ওর তো শুনেছি অনেক দুধ হয় গো।'

'আরে না, না। ওগুলো তো গোরুই নয়। গোরু তো ভারতীয় প্রজাতির, যার পিঠে কুজ থাকে। সেটাই গোরু। বাকি জার্সি কাউ অন্য এক সংকর প্রজাতির জানোয়ার।'

'তাতে কী? দুধ তো অনেক দেয়'।

'হুঁ হুঁ, বাবা অনেক পার্থক্য আছে। জিজ্ঞাসা করো না ডাক্তারবাবুকে। কী রে বল না।'

ছোটমামা একটু দূরে ছিল। কী কথা হচ্ছে ভালো করে শোনেনি। বলে উঠল, 'কি হলো? কিছু হলেই ডাক্তারদের গালি দাও কেন তোমরা?'

বড়মামা যেন একটু পটানোর ভঙ্গিতেই বললেন, 'না, না ছোট, আমরা তো ডাক্তারের সম্মান সবসময় করি। বলছিলাম, ভারতীয় গোরুর দুধের ব্যাপারে তোদের মেডিক্যাল সায়েন্সে কী যেন আছে বলছিলি।'

'হ্যাঁ, বি-টু ক্যাটাগরির দুধ বলে এটাকে। এটা পুষ্টিগুণে সব দিক থেকে ভালো।' বলেই ছোটমামা সোপানের দিকে ফিরে বলল, 'কি রে তুই এখনও গোরুর দুধের মহিমা শুনছিস? ওদিকে পুকুর পাড়ে তো যুদ্ধি হচ্ছে।'

মামাবাড়িটা ক্রমশ রহস্যের রোমাঞ্চের জায়গা হয়ে উঠছে সোপানের কাছে। সোপান নতুন উত্তেজনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে বলল, 'কেন? কী হচ্ছে পুকুরের ধারে?'

'জামোৎসব! সব তরুণের পাগলামি। জাম পাড়ার জন্য রামপুরহাট থেকে একটা ছেলেকে নিয়ে এসেছে। সেই ছোঁড়া মগডালে উঠে জাম পাড়ছে। আর নীচে চাদর পেতে সব জাম ধরছে।'

সোপান এসে দেখে সত্যিই উৎসবের চেহারা নিয়েছে পুকুরঘাট। এমনকী দাদুও এসে দাঁড়িয়েছেন গাছতলায়। যে ছেলেটি গাছে উঠেছে তার নাম দশরথ। বাচ্চারা নীচের থেকে চিৎকার করছে, 'দশরথদা বাঁদিকে, আরও বাঁদিকে। একটু একটু উপরে।'

দেখতে দেখতে নীচে পেতে ধরা চাদরটা ভর্তি হয়ে উঠল রসালো কালো জামে।

তরুণদা চিৎকার করে বলল, 'দশরথ নেমে আয় বাবা। ওই মগডালে উঠেছিস, আমার ভয় করছে। আর এত জাম এরা করবেটা কী?'

দশরথ কয়েক মিনিটের মধ্যে তরতর করে নেমে এলো। পেটানো চেহারা, জামাটা খুলে ফুলপ্যান্ট পরেই গাছে উঠেছিল। তরুণদা একটা গামছা দিয়ে বলল, 'নে, ঘামটা মুছে নে। তারপর চল, কী লুচি আর হালুয়া বানিয়েছে বড় বৌদি।'

M.T. GROUP

Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS

M.T. INTERNATIONAL

EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :
Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1, Embroidery, Bag closer and Aari Machines

Phones : Fac : 2222224, 2222225, 2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai *KNITWEARS*

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120

লুচির কথা শুনতেই সোপানের মনটাও নেচে উঠল। ও হাত-পা ধুয়ে লাল দালানে এলো। বড় গামলাতে ফুলকো ফুলকো লুচি, কালোজিরে দেওয়া সাদা সাদা আলুর তরকারি আর মোহনভোগ। ভাই-বোনেরা থালা নিয়ে বসে গেছে। হঠাৎ তরুণদা ভেতরে এসে বলল, 'তোমরা খাও, আমি চললাম। দশরথ ভেতরে খেতে আসতে চাইছে না।'

বোঝা গেল, দশরথ ভেতরে আসবে না। কারণ, ওরা লেট। দশরথ লেট। ওরা নীচু জাত। উঁচু জাতের লোকেরা বাড়িতে ঢুকতে দেয় না। ও কিভাবে একসঙ্গে খেতে বসবে?

শুনেই ছোটমামা লাফিয়ে উঠল, 'কী বলছ কী তুমি? কোথায় আছে দশরথ?'

ছোটমামা, তরুণমামাকে নিয়ে বের হয়ে এলো। পেছনে পেছনে টিপ, সোপানও দেখতে এলো।

ছোটমামা দশরথ লেটকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি ভেতরে যাবে না কেন? কোন যুগে বাস করছি আমরা? শিগগিরি চলো ভেতরে।'

দশরথ তবু ইতস্তত করছে, 'তবে আমাকে বাইরে এখানেই এনে দিন। এখানেই খাব।'

'তাহলে আমরাও সবাই এখানে বসেই খাব। কারণ তোমার সঙ্গে একাসনে বসে না খেলেই আমাদের পাপ হবে।'

দশরথ লেট যখন লাল বারান্দাতে এলো তখন ওর চোখ ছলছল করছে। দাদু ওকে বলল 'বাবা বসে পড়, লুচি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কি ভাল লাগবে? দে, দে দশরথকে লুচি দে।'

সবাইকে খেতে দেওয়ার পরে তরুণমামা বলে উঠলেন, 'এক মিনিট। আজ সকালের জলযোগের আগে একটা মন্ত্র পড়ে খাওয়া শুরু করব।'

সবাই একেবারে চুপ করে গেল। ঋক, ঋজিক, টিপ হাতজোড় করে বসল। তরুণমামা শ্লোক শুরু করল—

'হিন্দবঃ সোদরা সর্বে / ন হিন্দুঃ পতিত ভবেৎ
মম দীক্ষা হিন্দু রক্ষা / মম মন্ত্রঃ সমানতাঃ'।।

ঋক শ্লোক শেষ হতেই বলল, 'কাকু, আমি বলব অর্থটা?'

শ্লোকটার মানে— সব হিন্দুই সহোদর ভাই, কোনও হিন্দু পতিত হতে পারে না। হিন্দুকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম, সমান ভাবাই আমার মন্ত্র।'

একটু পরেই দশরথ স্বাভাবিক হয়ে এলো। সবার সঙ্গে একটু একটু কথা বলা শুরু করল।

মেজমামি জিজ্ঞাসা করলেন, 'দশরথ, তুমি কী করছ এখন?'

'আমি কলেজে পড়ি। রামপুরহাট কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে।'

'পাশ কোর্সে না অনার্স?'

'সংস্কৃতে অনার্স। উচ্চ মাধ্যমিকে আমার সংস্কৃতে ভালো নম্বর হয়েছিল।'

তরুণদা জানায়, 'ওর এইচ এসে সংস্কৃতে লেটার নম্বর ছিল।'

লুচি পর্ব শেষ হলে জাম মেখে নিয়ে এলো যশোদাদি। টুসটুসে পাকা কালো জাম। নুন আর একটু লঙ্কা কুচো— একেবারে ফাটাফাটি স্বাদ হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার। সবারই কাজে বের হতে হবে। বড়মামার দোকানের সময় হয়ে যাচ্ছে। মেজমামার স্কুলের, ছোটমামার চেম্বারের। স্কুল অবশ্য সকলেরই আরও কিছুদিন ছুটি। তরুণমামাও দশরথকে বাইকে চাপিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

মা আরও দুদিন থাকবেন। সোপান পনেরোদিন এখানে থেকে যাবে। ঋক আর ঋজিক পড়তে বসে গেল। উপরের জানালা দিয়ে এক এক করে তিন মামাকে বেরিয়ে যেতে দেখল সোপান। মা মামিদের সঙ্গে রান্নাঘরে। কিন্তু টিপ কোথায়? দেবাদ্রিতা তো এলো না পড়তে।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে টিপের গলার অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল— 'খিয়া-হট-হট।'

সোপান ভাইয়ের চোখের দিকে তাকাল। চোখে প্রশ্ন, 'কী ব্যাপার রে? কী করছে দিদি?'

ঋক একটু মজার হাসি হেসে বলল, 'যাও না, গিয়েই দেখ না।'

একটু ইতস্তত করেও সোপান দেখতে গেল। আসলে ও কৌতূহল সামলাতে পারছিল না। পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, দেবাদ্রিতা সাদা সালওয়ার কামিজে কোমরে কমলা ওড়নাটা বেঁধে পা দাবিয়ে হাতের মুঠো তৈরি করে মারছে। সোপান মিনিট দুয়েক বোনকে ক্যারাটের বিভিন্ন ভঙ্গিমাতে দেখল। এবার ওর দিকে চোখে চোখ পড়তে, টিপ হেসে বলল, 'যাচ্ছি।' সোপান পড়ার ঘরে ফিরে এলো।

আরও কিছুক্ষণ পরে এলো দেবাদ্রিতা। হাসি মুখে বসল বই খাতা নিয়ে। বলল, 'আমি একেবারে সকালে উঠেই এটা করে নিই। আজ মন্দিরে গিয়েছিলাম, তাই প্র্যাকটিস করা হয়নি।'

'তুই কি ক্যারাটে শিখছিস?'

'ক্যারাটে? প্রায় তাই। আমরা বলি নিযুদ্ধ।'

'কতদিন হলো শিখছিস?'

'চার মাস হলো। আমি রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কিশোরী বিকাশ বর্গে গিয়েছিলাম। সেখানে কিশোরীদের কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় শিখিয়েছে।'

সোপানেরও একসময় ক্যারাটে শেখার খুব ইচ্ছে

হয়েছিল। কিন্তু ট্রেনিং সেন্টারটা বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে ছিল। সপ্তাহে দু-দিন করে কীভাবে যাবে, এইসব ভেবে বাবা আর নিয়ে যেতে পারেননি। তাই সোপান প্রশ্ন করল, 'চার মাসে একবার শিখলে হবে? রেগুলার কোনও ইন্সট্রাকশন লাগে না?'

'প্রতি সপ্তাহে একবার যাই তো। রামপুরহাটে সমিতির সাপ্তাহিক মিলন হয়। আমরা এখান থেকে পাঁচজন মেয়ে যাই। আমাদের গ্রামেও শুরু হবার কথা সমিতির শাখা।'

একটু থেমে বলল, 'তাছাড়া কিশোরী বিকাশের ওই তিনদিনের ক্যাম্পে মার্শাল আর্ট ছাড়াও অনেক কিছু শেখানো হয়েছিল। যোগাসন ও বিপদের পরিস্থিতিতে কি করতে হবে সেসব শেখানো হয়েছিল। আমাদের খুব ভালো লেগেছিল।'

সোপান মন দিয়ে শুনছিল বোনের কথা। বলতে বলতে দেবাদ্রিতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। খুব আবেগের সঙ্গে বলল, 'একটা ধ্বনি আমার এত ভালো লেগেছিল যে আমি রোজ, দু-চার বার বলি, 'বেশ ভালো করে এটা নিঃশ্বাস নিয়ে স্লোগান দিল—

'ফুল ভি হ্যায় চিঙ্গারী ভি হ্যায়
হম ভারত কী নারী হ্যায়।'

ফুল হওয়া কোনও লজ্জার বিষয় নয়। ফুল জগতের অপূর্ব সৃষ্টি। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজনে আগুনের ফুলকিও হতে পারি। আমরা ভারতের নারী ফুলের মতো সুন্দর কিন্তু আগুনের ফুলকির মতো তেজস্বী।

আজ দুপুরে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল সোপান। জানালা দিয়ে আকাশের একটা ফালি দেখা যাচ্ছে। সাদা তুলোর মতো চকচকে মেঘ উড়ে চলেছে। অনেক দূরে প্রায় টিক চিহ্নের মতো কালো কী পাখি গোল গোল করে উড়ছে। সেই দিকে তাকিয়ে মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে আসছে। তরুণমামা বলছিল, 'নিজের জন্য বাঁচা আবার বাঁচা নাকি? দেশের জন্য, মানুষের জন্য বাঁচতে হয়।' গতকাল থেকে অদ্ভুত একটা জগতে যেন এসে পড়েছে সোপান। একদম অপরিচিত কিন্তু... যেন এমনটাই...

আজ বিকালে শাখায় আর এক অভিজ্ঞতা হলো। আজ শাখায় সেবা দিবস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিশলয়ের সেই দুটি লাইন—

'আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করার দিন।'

থেকেই হয়তো পশ্চিমবঙ্গে এই দিনটাকেই সাপ্তাহিক সেবা দিবস হিসাবে গণ্য করে এরা। সেবা দিবস মানে শাখার মধ্যে সেবার বিষয়ে গান, সেবাকাজের আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান-প্রদান আর সেবা কাজে প্রথিতযশা কোনও মনীষীর জীবনী থেকে কেউ একটা সত্য কাহিনি বর্ণনা করেন। আজ ভগিনী নিবেদিতা কীভাবে কলকাতা শহরে প্লেগ রোগাক্রান্তদের সেবা করেছিলেন সেই কাহিনি শোনানো হলো। আয়ারল্যান্ডের মেয়ে মার্গারেট নোবেল বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আহ্বানে ভারতে এসে দেশটাকে নিজের করে নিয়েছিলেন। তখন কলকাতায় প্লেগের ভীষণ প্রকোপ। নিবেদিতা তাঁর যুবক ভক্তদের নিয়ে নিজের হাতে শহর পরিষ্কার করার দায়িত্ব নেন। রোগীদের সেবা করেছিলেন নিজের প্রাণের চিন্তা না করে। অথচ তিনি যখন দার্জিলিং শহরে মারা যান তখন তাঁর দুবেলা পেট ভরে খাবার মতো সংস্থান ছিল না। শুনতে শুনতে সোপানের চোখে জল এসে গেল। এবছরটাই তাঁর জন্মের দেড়শো বছর পূর্ণ হলো। এই দুদিনেই সোপান সঙ্ঘের শাখার নিয়ম-কানুন কিছুটা শিখে গেছে। শাখা থেকে বের হয়ে আজ ওরা গ্রামের মূল দুটো রাস্তা পরিষ্কার করার কাজে লাগল। সব প্লাস্টিক এক জায়গায় করে রাখা হলো। কাগজ আর অন্য পচনশীল নোংরা আলাদা করা হলো। তারপর কাজ শেষ হলে, ঝাটা, বালতি, কোদাল জলে ধুয়ে আবার শাখার মাঠে ফিরে এলো। আজও প্রার্থনা করে শাখা শেষ হলো।

ওরা শাখা শেষ করে ফিরছে, দেখল বাড়ি থেকে ছোটমামা বাইক নিয়ে বের হচ্ছে। ওদের দেখে গাড়ি থামিয়ে দাঁড়ালেন মামা। 'কী রে সোপান, তোর এখন কী প্রোগ্রাম?'

'না, মানে আমার আবার কী প্রোগ্রাম?'

সোপান আমতা আমতা করে বলে।

'তবে চল আমার সঙ্গে, এক জায়গায় যাব।' মামা ইঙ্গিতে বাইকে উঠতে বলে।

ছোটমামা ঋক আর ঋজিককে বলেন, 'তোরা তো পড়তে বসবি। আমি সোপান দাদাকে নিয়ে যাই, কাল তোদের ভালো জায়গায় নিয়ে যাব। আজ দাদাকে দিয়ে একটু কম্পাউন্ডারের কাজ করাই।'

বাইকের পেছনে একটা ছোট হেলমেট ছিল। সেটা সোপানের হাতে দিয়ে ছোটমামা বলল, ' নে হেলমেট পরে নে।'

'এখানে হেলমেট পরতে হবে? এই গ্রামে পুলিশ কোথায়

যে ধরবে?'

'হেলমেটটা তোর সেফটির জন্য, পুলিশের সেফটির জন্য নয়। মেলা কথা বাড়াস না। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বাইক স্টার্ট দিয়ে দিল ছোটমামা। ব্রাহ্মণী নদীর উপরের লোহার সেতুটাই গ্রামের সীমানা। গ্রাম ছেড়ে বের হয়ে এলো মামা-ভাগ্নে। দু-পাশে ধানের ক্ষেত। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবছে। আকাশে অনেক রঙের মেঘ। পাহাড়ের মতো থরে থরে সাজানো। আর সূর্যের লাল আভা। দুটো দিকেই দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। মাঠের মাঝখানে কেবল একটা দুটো বটগাছ, পিপুল গাছ, তেঁতুল গাছ, কোথাও বা সারি দিয়ে তালগাছ।

সোপান মুগ্ধ হয়ে দেখছিল অস্তরবির শোভা আর প্রকৃতির সুষমা।

'বল তো এখন কোথায় যাচ্ছি?' মামা মুখ একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল।

'ওই যে বললে তোমার চেম্বারে যেতে হবে। আমাকে নাকি কম্পাউন্ডার হতে হবে।' বলল সোপান।

মামা আবার মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন, 'আজ আমার চেম্বার বন্ধ। আর আমার চেম্বারে তো ওষুধ দেওয়া হয় না। কম্পাউন্ডার লাগে না। শুধু নাম লেখার জন্য একজন আছেন। আজ অন্য এক জায়গায় যাব।'

আধঘণ্টা চলার পর একটা ছোট গ্রামের মধ্যে ঢুকল মামার এনফিল্ড বুলেট। একটা বাড়ির সামনে এসে থামল বাইক। বাড়ির বারান্দায় একটা টেবিল পাতা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তাই আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে আলো যে খুব জোরালো তা নয়, সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে সারি সারি বেঞ্চে লোক বসে আছে। এবার মামা খুলে বললেন, 'আসলে আজ সেবা দিবস তো তাই প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমি বিনা পয়সায় রোগী দেখি। এই তিনটে গ্রাম খুব গরিব।'

গ্রামের দুটি ছেলে ব্রজেশ আর রাজীব সব ব্যবস্থা করে। ওরা এই গ্রামেরই ছেলে। ওরা অন্য ডাক্তারবাবুদের কাছ থেকে স্পেসিমেন স্যাম্পেল জোগাড় করে আনে। তুষারদা নামে একজন মাস্টারমশাই ছোটমামার প্রেসক্রিপশন দেখে বিনা পয়সায় ওষুধের পাতা দেন। আজ উনি আসেননি। তাই সোপানকে ওই কাজ করতে বলা। সোপান শুনে একটু ঘাবড়ে গেল। 'মামা, আমি কি পারব? আমি তো কখনও করিইনি এমন কাজ।'

'পারবি না কেন? ইংরেজিতেই তো লেখা থাকবে। আর তিনচারটে কথা বলে দিচ্ছি। ধর 'বিডি' মানে হল....' এমন দু-তিনটে জিনিস ভালো করে বুঝিয়ে দিল ছোটমামা।

আজ সত্যিই একটা অভিনব অভিজ্ঞতা হলো সোপানের। সব রোগী দেখা হয়ে গেল। সবার ওষুধ দেওয়া গেল না। অনেক ওষুধই জোগাড় করা ছিল না। তাদের বলা হলো একটু কষ্ট করে কিনে নেওয়ার জন্য। সব মিলিয়ে সোপানের মনে হলো, আজ নিজের ক্ষমতায় একটা সত্যিকারের কাজের মতো কাজ করেছে। একটা গভীর আত্মবিশ্বাস অনুভব করল নিজের মধ্যে।

শেষ রোগীটিকে দেখে ছোটমামা ব্রজেশের দিকে তাকালেন হাসি মুখে, 'কি গো আর কেউ নেই তো?'

ব্রজেশ এগিয়ে এসে বলল, 'না, ডাক্তারবাবু। তবে রহিম ফকির এসেছে। ওর ছেলে সুস্থ হয়ে গেছে। আপনাকে চা খাওয়াতে নিয়ে যাবে। আপনি কি যাবেন?'

বলতে বলতেই রহিম ফকির বারান্দায় উঠে এলেন। একেবারে কান এঁটো করা হাসি হেসে বললেন, 'ডাক্তারবাবু চলুন তাহলে।'

ছোটমামা হেসে বললেন, 'চলো একটু চা খেয়ে আসি। তুমি এগিয়ে যাও, আমরা যাচ্ছি।'

রহিমচাচা চলে যাওয়ার পরে মামা বললেন, 'চল একবার ঘুরে আসি। না গেলে দুঃখ পাবে। এমনিতেই ফকিরদের মুসলমান সমাজের মধ্যে নীচু জাতি বলে মনে করা হয়।'

সোপান আকাশ থেকে পড়ল, 'কি? মুসলমান সমাজের মধ্যেও জাতপাত আছে নাকি? জাতপাত তো হিন্দুদেরই হয়।'

'হ্যাঁ, হয়। এমনকী ফকির সম্প্রদায়ের মানুষ মারা গেলে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে তাদের কবরও দিতে দেওয়া হয় না।'

রাজীব সমর্থন করে বলল, 'ডাক্তারবাবু ঠিকই বলছেন। কবর দেওয়া নিয়ে কিছুদিন আগেও গণ্ডগোল হয়েছিল। ফকিররা নীচু জাত বলে তাদের আলাদা কবরখানা করতে হবে। এইসব নিয়েই গণ্ডগোল।'

কথায় কথায় রফিক চাচার বাড়িতে পৌঁছে গেল ওরা। ঘরে ঢুকতে যাবে হঠাৎ বাইকের শব্দ। আধো আঁধারি গ্রামের রাস্তা দিয়ে বাইকের আলো উঠোনে এসে থামল। 'তরুণমামা।' প্রায় চিৎকার করে উঠল সোপান। অদ্ভুত ব্যাপার, তরুণমামাকে দেখলে মনের মধ্যে যেন একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যায়।

তরুণদা বাইক রেখে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'এটা কী হলো রহিমদা? ডাক্তারকে নেমতন্ন হলো আর আমরা কি বানের জলে ভেসে এলাম?'

রহিমচাচা লজ্জা পেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এসে বলল, 'আরে তরুণদা, আপনি আসবেন এ তো আমাদের সৌভাগ্য। এই গরিবের ঘরে আপনার। এসেছেন, কী আনন্দের...'।

রহিমচাচার ছেলে ইসমাইল ক্লাস নাইনে পড়ে। ওরই

With Best Compliments from -

Damiyaas Enterprises

(Banwari Lal Watch Co.)

*** Watches - TISSOT, CASIO**

*** Gold and Diamond Jewellery**

*** Gems**

1, Ambedkar Road

Ghaziabad - 201 001 (U.P.)

Mobile : 9871835848, 9213789652

With Best Compliments from -

Redox Pharmachem Pvt. Ltd.

Office : C-46, Defence colony
New Delhi - 110 024
India

SAHARA®

Air Coolers, Storage Water Heaters, Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans, Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors

VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :
SAHARA Electrical Appliances
D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com

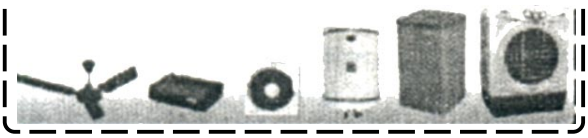

011-32306597
011-30306592

SRE

SNEH RAMAN ELECTRICALS PVT. LTD.

E-12, Sector - XI, Noida -201 301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)

Ph. : 91-0120-3090400, 91-0120-3090401,

Manufacturer :

Power Transformers ● Furnace Transformers ● Voltage Stabilizer-Manual/Servo ● D.C. Drive ● Control Panels HT/LT/Metering ● Distribution ● Automatic Starters upto 500 H.P. ● Turn Key Projects ● Electrical-Mechanical ● OrderSupplier● Traders (Heavy Electrical Repair's)

Regd. Office : W.Z. 3227, Mohindra Park, Shakur Basti, Rani Bagh, Delhi

কঠিন অসুখ হয়েছিল। ওই থালায় করে করে খাবার নিয়ে আসছিল। ওদের ঘরের ভেতরে বসার জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেই। সবাইকে খাটের উপরেই বসতে হয়েছিল। তরুণদা আসায় স্থান একটু কম হচ্ছিল। ইসমাইলরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তরুণদা স্বাভাবিকভাবে বলল, 'সোপান আর রাজীব তোমরা খাটের উপরে উঠে যাও। আমরা খাটের সামনে বসছি।'

ওরা এটাকে বলে হাতঝাড়া পিঠে। গরম কড়াইতে সামান্য একটু তেল বেগুনের বোঁটা দিয়ে দিয়ে চালবাটার পাতলা গোলা হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ছড়িয়ে দিতে হয়। ইসমাইলের মা অসাধারণ বানিয়েছেন পিঠেটা। সঙ্গে কষা কষা আলুর দম। পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে এত সুন্দর হয়েছে, যেমন গন্ধ, তেমন স্বাদ। সোপান খেতে গিয়ে বলল, 'এ তো পুরো পেপার ধোসা, কী দারুণ বানিয়েছে চাচি।'

শুনে ভেতর থেকে চাচি বেরিয়ে এসে হাসাত হাসতে বললেন, 'এটাকে অনেকে সরুচাকলিও বলে, আরও দিচ্ছি।'

ওরা দুটো তিনটে করে পিঠে খেল। শেষের দিকে তালের গুড় দিয়ে। ইসমাইলদের চারটে তালগাছ। তালের রস থেকে বাড়িতেই তৈরি হয়েছে গুড়।

তরুণদা খেতে খেতে জানাল, 'ডাক্তার শনিবারের বর্গের জন্য সার্জারির ডাক্তারবাবু আর দুজন টেকনিশিয়ান রাজি হয়ে গেছেন।'

ছোটমামার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'গ্রেট। সার্জেন মানে ডা: উজ্জ্বল ভদ্র? উনিই কি আসছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আজ চণ্ডীদা কলকাতায় গিয়ে কথা বলে এসেছেন।'

'বাঃ, দারুণ ব্যাপার। ডা: ভদ্র তো আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন। স্যারের সঙ্গে অনেকদিন পরে আবার দেখা হবে।'

'কাল ব্যবস্থা বৈঠক হবে সন্ধ্যায়। মোট পঁয়তাল্লিশ জন শিক্ষার্থী থাকবে। খাওয়া-দাওয়া থাকার ব্যবস্থা সব করতে হবে।'

রহিমচাচা, সুফিয়া চাচিদের থেকে বিদায় নিয়ে ওরা বেরিয়ে এলো। রাজীব আর ব্রজেশের টিউশন আছে, ওরাও বিদায় নিল।

তরুণমামা বাইকে উঠে বলল, 'ডাক্তার আজ তো চেম্বার বন্ধ। ভাগ্নে এসেছে কাল, আর আমার বাড়িতে একবার গেল না, এটা কেমন হবে? একবার চলো, আমার গরিবখানায়।'

ছোটমামা একটু ভেবে বলল, 'বেশ একবার নিবাসে যাওয়াই যায়।'

তরুণমামা বাড়িটা বেশ বড়সড়। দোতলায় অনেকগুলোই ঘর। কয়েকটা ঘরে ছেলেরা পড়াশুনাও করছে। কিন্তু কোনও মহিলা নেই। সোপানের কেমন যে একটু অদ্ভুতই লাগল। কিন্তু প্রতিটি জায়গা একেবারে পরিপাটি করে সাজানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সোপানের কৌতূহল হলো, 'তরুণমামা বাড়িতে কে কে আছেন?'

তরুণদা একটু যেন রহস্য করে বলল, 'বাড়িতে? আমি আর আমার কয়েকজন ভাই থাকি।'

'আর মা-বাবা?'

'মা-বাবা কোচবিহারে থাকেন। ওখানে এক দাদা, বৌদি আর এক বোনও আছে।'

ছোটমামা এগিয়ে এসে বললেন, 'আরে তরুণদা তো প্রচারক। সংসার, বাড়ির সকলকে ছেড়ে দেশের কাজের জন্য বের হয়ে এসেছে। এটা সঙ্ঘের কার্যালয়, মানে অফিস। আমরা বাংলাতে এই বাড়িকে বলি 'নিবাস'। আর কয়েকজন এখানে থেকে পড়াশুনা করে। ওরাও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।'

তরুণদা তখনও মিটিমিটি হাসছে, 'এই ছেলেরা সবাই কলেজে পড়াশুনা করে। এই নিবাস রামপুরহাট স্টেশনের খুব কাছে। তাই যাদের শহরে বাড়ি ভাড়া করে থাকার সামর্থ্য নেই, গ্রামের সেই স্বয়ংসেবকরা এখানে থেকে পড়াশুনা করে।'

বাড়িটার পিছনে একটা সুন্দর চারকোণা মাঠ। মাঠটা ঘিরে কি যেন একই গাছ লাগানো। ইলেকট্রিক আলোতে ফুল গাছ কী অন্য কোনও গাছ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তরুণমামা মাঠটা দেখিয়ে বলল, 'এই মাঠে সকালে একটা শাখা হয়, আর বিকালে আর একটা শাখা। যারা অফিসে কাজ করে, ব্যবসা করে, কলেজে পড়া তরুণ ছেলেরা সকালবেলার শাখায় আসে। আর স্কুল কলেজের ছাত্ররা আসে বিকেলের শাখায়।'

সোপান ঘুরে ঘুরে দেখছিল বাড়িটা। নীচে একটা বড় হলঘর। হলের একদিকের দেওয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। ধ্যানমুদ্রায় বসা বিশাল প্রতিকৃতি। তার নীচে একটা পিলসুজের উপর একটা প্রদীপ। কিন্তু দুদিকের দেওয়ালে দুজনের বড়ো ছবি। একজন গোঁফওয়ালা কালো টুপি করে, অন্যজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো দাড়ি কিন্তু চোখে চশমা। ফটোর সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সোপান। ছোটমামা কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, দাঁড়া তোকে এনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ওই যে কালো টুপি মাথায়, মোটা গোঁফ উনি হলেন এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ডা: কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। উনি কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে এসেছিলেন। সেই সময় কলকাতা ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র। কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার আসলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হতে

চেয়েছিলেন। ডাক্তারি পড়াটা আসলে ছিল ছুতো। কলকাতায় এসে উনি পুলিনবিহারী দাসের অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯১৯ সালে দামোদরের বন্যার সময় কেশব রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সেবাকাজে দিনরাত এক করে দিয়েছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। তিলকের মৃত্যুর পর ১৯২৫ সালে একটি প্রচারবিমুখ নিঃস্বার্থ সংগঠন তৈরি করে, যা আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।'

তরুণদার সঙ্গে একটি ছেলে হলের মধ্যে ঢুকল। একটা প্লেটের মধ্যে দুটো গ্লাসে পুদিনার সরবত। সরবতের গ্লাস দুটো মামা আর ভাগ্নের হাতে দিয়ে বললেন, 'গরিবের ঘরে সামান্য একটু সরবত, বেশি কিছু দিতে পারলাম না।' সবাই হেসে উঠল।

সোপান সরবতের গ্লাস হাতে দ্বিতীয় ছবির সামনে দাঁড়াল। ঋষিদের মতো বড় দাড়ি, সাদা পাকা, চশমার ভেতরের চোখটা অতি গভীর,'আচ্ছা, উনি কে?'

'ইনি মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে সেখানেই অধ্যাপনা করতেন। সেখান থেকে বাংলায় আসেন। রামকৃষ্ণ মিশনের একটা আশ্রম আছে মুর্শিদাবাদের সারগাছিতে। সেখানে বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে আশ্রমেই থাকতেন। অখণ্ডানন্দজী দেহ রাখার আগে মাধব গোলওয়ালকরকে মহারাষ্ট্রে ফিরে সামাজিক কাজ করতে বলেন। মাধব আগে থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেনারসে অধ্যাপনা করার সুবাদে তাঁকে সবাই গুরুজী বলত। উনি সারগাছি থেকে ফিরে এসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। উনি হয়েছিলেন দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক, মানে সংগঠনের প্রধান।'

সোপান এই মহাপুরুষদের নামই কখনও শোনেনি। ওর অবাক প্রশ্ন, 'আমরা ইতিহাসে তো এনাদের কথা পড়িনি।'

'হ্যাঁ, এনাদের জীবনীও আমাদের পাঠক্রমে পড়ানো উচিত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে ডা: হেডগেওয়ারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন নাগপুরের রামভাউ রুইকর।' ছোট মামা বলতে বলতে কেমন আবেগপ্রবণ হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তরুণদা নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে উঠল, 'আমাদের দেশের ইতিহাসটা কতটা ঠিকঠাক পড়নো হয় ডাক্তারবাবু? ক্ষুদিরাম বসু আজকের পাঠ্যপুস্তকে হয়ে গেছেন সন্ত্রাসবাদী। সেদিন এক শিক্ষিত মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে আমার একটু...'

তরুণমামা যে ঘটনা বলল শুনে সোপানের বুকের মধ্যে যেন রক্ত ছলকে উঠল। তারাপুরে এক রাজনৈতিক নেতার ছেলে শাখায় আসত। ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান ছিল, যোগ ব্যায়াম, সুভাষিত আবৃত্তি দারুণ করত। কিছুদিন পর থেকে ছেলেটি আসা বন্ধ করে দিল। কয়েকদিন দেখে তরুণমামা একদিন ছেলেটির বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তরুণমামাকে দেখে ওই ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'কেন আমার ছেলের সময় নষ্ট করাচ্ছেন। শাখার মাঠে গিয়ে কি ও চাকরি পাবে, না সার্টিফিকেট পাবে? আমার ছেলেটা কি ক্ষুদিরাম হবে?'

ক্ষুদিরামের নাম শোনার পরে তরুণমামা নাকি কিছুক্ষণ চুপ করে গিয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল, 'দাদা ক্ষুদিরামকে আপনি বোধহয় ঠিকঠাক বোঝেননি, ক্ষুদিরামের মতো স্বার্থহীন দেশভক্ত প্রকৃত অর্থেই ক্ষণজন্মা। পরিবারে একজন ক্ষুদিরাম জন্মাবার জন্য কয়েক প্রজন্মের সাধনা প্রয়োজন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার বাড়িতে ক্ষুদিরাম জন্মাবে না!'

মা আজ সকালে তারাপীঠে যাবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু সক্কাল সক্কাল একটা বিপত্তি শুরু হয়ে গেল। কাল রাত থেকে সোপান বায়না ধরেছে যে, শনিবারের ক্যাম্পে ও শিক্ষার্থী হয়ে যাবে। দুদিনের ওই শিবিরে ফাস্ট এইড অ্যান্ড এমার্জেন্সি সার্ভিসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা হলো ন্যূনতম যোগ্যতা। তাই সোপান একেবারে কানের পাশ দিয়ে বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে অংশ নিতে পারবে। কলকাতা থেকেও স্পেশালিস্ট ডাক্তারবাবুরা আসছেন। আর কাল সারাদিন সঙ্ঘের বিভিন্ন কাজকর্ম দেখে সোপান তো একেবারে টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু মা একেবারে পরিষ্কার উত্তর দিলেন, 'না! কখনো না! তুই এই বাড়ির বাইরে কোথাও যাবি না। এসব করলে তোকে সঙ্গে করে আমি নিয়ে যাবো। এখানে থাকতেই হবে না।'

সোপানও নাছোড়বান্দা। 'না, যাবই আমি। একটা ভালো জিনিস, শেখার জিনিস....

মা চোখ বড় বড় করে ধমক দিলেন। 'একদমই না। তোমার বাবাকে আমি এসব বলতে পারব না। তাছাড়া এসব

আমাদের ওখানেও হবে, তখন...'। তারপর কী মনে হওয়ায় সোপানকে ছেড়ে দিয়ে ছোটমামাকে একহাত নিতে শুরু করলেন, 'এই শ্রীকান্ত, তুই একে এসবে নাচিয়েছিস কেন রে? তোর জামাইবাবু শুনলে খুব রাগ করবে।'

ছোটমামা যে এভাবে পাল্টি খেয়ে যাবে সোপান তা স্বপ্নেও ভাবেনি। ছোটমামা বলল, 'না, না। আমি তো যেতে বলিনি। ঠিকই তো এরকম ক্যাম্প তোমাদের ওখানেও নিশ্চয়ই হবে। তোর এই ক্যাম্প করতে হবে না।'

তারপর মাকে বলল, 'তুমি এসব নিয়ে বকাবকি করবে না। পুজো দিতে যাবে? হেমন্তদা গাড়ি রেডি করে অপেক্ষা করছে, তাড়াতাড়ি চলো।'

গাড়ি চলল তারাপীঠ মন্দিরের দিকে। রাস্তাতেও মা দু-তিন বার সোপানকে 'একদম ওইসব করবি না, বাবাকে বলে দেব, তোর এখানে থাকতেই হবে না— আমার সঙ্গে ফিরে চল কাল।' ইত্যাদি প্রভৃতি বলে শাসিয়েছেন।

আজ তারা মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে মা খুব খুশি হয়েছেন। অনেকেই ছোটমামার পরিচিত। একেবারে বড়ো রাস্তা থেকে পুজোর ডালার দোকান কী কেউ বলছে ডাক্তারবাবু, কেউ বা শ্রীকান্তদা। যেই শুনছে ডাক্তারবাবুর দিদি, তো একেবারে বিশেষ ট্রিটমেন্ট। মা পুজো দিয়ে খুশি খুশি মুখে বললেন, 'এই একটু কচুরি আর জিলিপি খাবি নাকি?'

বাড়িতে ফিরতে ফিরতে প্রায় বারোটা বেজে গেল। দুপুরে খেতে খেতে দেড়টা। ভাই-বোন সবাই ঘুমোচ্ছে। সোপানের ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল না। ও উঠে পাশের ঘরে গেল। উপরের ঘরের জানালাগুলো খুব বড় বড়। প্রায় মেঝে পর্যন্ত জানালাগুলো।

ধ্যুস্ মা-টা না কিছু বোঝে না। নিজে তৈরি না হলে মানুষের সেবা করবে কী করে? দেশে কত মানুষের বিপদ, কত আর্ত মানুষ। নিজের জন্য বাঁচা আবার বাঁচা নাকি? চোখ ভরে জল এসে গেল। সামনের পুকুর, নারকেল গাছ, সুপারি গাছ... সব ঝাপসা হয়ে আসছে।

হঠাৎ কে যেন সোপানের কাঁধে হাত রাখল। চোখটা মুছে সোপান পিছন ফিরল, মা!

'মন খারাপ? ঠিক আছে ক্যাম্পে যাস। তবে খুব সাবধানে থাকবি। তোর বাবার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।'

সোপান, 'মাগো,' বলে জড়িয়ে ধরল। মা ওর মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন। 'যা একটু শুয়ে নে। সেই সকালে উঠেছিস।'

আজ বিকেলে শাখায় গিয়ে দেখে শাখায় অনেক ছেলে এসেছে। আজ সোপান দেখল, সংখ্যা বেশি হলে শাখায় তিনটে আলাদা গণ হয়। যুবকদের ব্যায়াম, খেলা সব আলাদা আলাদা ভাবে হয়। আজ যুবকদের গণে প্রথমে কিছুক্ষণ লাঠি খেলা হলো, তারপর জোরদার কবাডি খেলাতে মেতে উঠল যুবকরা। একদিকের দল চিৎকার করে স্লোগান দিচ্ছে, 'জয় শিবাজী'। উল্টো দিকের দলও চিৎকার করে উত্তর দিচ্ছে, 'জয় ভবানী।' তারপরেই 'কবাডি কবাডি কবাডি' বলে এক একজন এগিয়ে আসছে। বালকদের গণে বেশিটাই খেলা হলো। সঙ্গে সামান্য যোগাসন। একটা খেলা ভীষণ মজার। খেলাটার নাম 'রাজা সাজা।' দুটো দলে দুজন রাজা সাজবে। মানে রাজা বলে ঠিক হবে। সৈন্যরা রাজাকে ঘিরে থাকবে। বিরোধী দলের সৈন্য এসে রাজাকে ছুঁতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তখন যদি রাজার সেনারা সেই ছেলেটিকে ধরে যদি রাজার কাছে নিয়ে আসতে পারে, আর রাজা যদি তার মাথায় হাত দিয়ে দেয় তো সে এই পক্ষের সৈন্য হয়ে যাবে। বিরোধী সেনা যখন আক্রমণে ব্যস্ত তখন প্রথম দলের তিনজন হাট্টাকাট্টা বালক চুপি চুপি বিপক্ষ দলের রাজাকে পাঁজাকোলা করে তুলে এপারে নিয়ে চলে এল। আর এই পক্ষের ছেলেরা জয়োল্লাস করে উঠল, 'জয় মা ভারতী, জয় জয় কালী।'

শিশুদের গণটাই সবচেয়ে মজার। দু-একজন তো একেবারে 'বর্ন লিডার।' ওরাই বন্ধুদের ঠিকঠাক করে লাইনে দাঁড় করাচ্ছে। একটা খেলা হচ্ছিল, তার নাম, 'ম্যায় শিবাজী'। ছোটছুটি খেলা আরও একটা হলো 'নমস্তে মহারাজ'। মনে রাখা আর রিফ্লেক্সের খেলা 'স্বামীজী আর নেতাজী' হয়ে গেল। খেলা শেষ হলে বাচ্চারা সেই প্রথম দিনের মতো 'হাতি-ঘোড়া-পাল কী / জয় কানাইয়া লাল কী।' বলতে বলতে গোল হয়ে দাঁড়াল। তারপর ওদের জন্য একজন দাদা একটা সুন্দর গল্প বলল। স্বামী বিবেকানন্দ যখন ছোট্ট ছেলে, সেই ছোট্ট নরেন কিভবে একজন আহত ফিরিঙ্গি বণিককে শুশ্রূষা করেছিলেন সেই কাহিনি শোনানো হলো।

তারপর যুবক বালক আর শিশুদের গণগুলো লাইন করে দাঁড়ালো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মপরিচয়' থেকে পাঠ করে অমৃতবচন শোনানো হলো। একটা সংস্কৃত শ্লোক আর তার মানে বলে 'সুভাষিত' শোনানো হলো। সবশেষে প্রার্থনা করে শাখা শেষ হলো।

আজকের সন্ধ্যাটা সোপানের বহুদিন মনে থাকবে। মা কাল সকালে চলে যাবেন, তাই মেজমামিমা উদ্যোগ নিয়েছেন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। লাল মেঝের যে বারান্দাতে খাওয়া হয়, সেই জায়গাটা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। সাজানো হয়েছে শুধু লতা, পাতা আর ফুল দিয়ে। সবই বাড়ির বাগান থেকে সংগ্রহ করা। কলাপাতায় সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন,

ARYA TOURIST LODGE

Just 5 Minute walk from N.D. Rly. Station

Only 1 km. from Connaught Place

Homely Atmosphare

Day & Night Taxi Facilities

8526, Ara Kashan Road

Ram Nagar, New Delhi - 110055

Phones : 23622767, 23623398, 23618232

STD : 23530775, 23533398,23618232 **Cont : 9811044543**

E-mail : arya_tourist_lodge@yahoo.co.in **Fax : 91-11-23636380**

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

আমপাতার ঝালর, লাল অশোক ফুল, বেগুনি রংয়ের জারুল, লাল কৃষ্ণচূড়া, গোলাপি রাধা চূড়া ফুল দিয়ে এত সুন্দর সাজানো হয়েছে যেন জায়গাটায় অপরূপ লাবণ্য ছড়িয়ে পড়েছে। আজও তিন মামা তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলেন। বড়মামা তো একেবারে কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি পরে নেমে এসেছেন। মা আজ খোঁপাতে একটা ধবধবে সাদা ও বড় গন্ধরাজ ফুল দিয়েছেন। বড়মামি টিপকে নাচের জন্য সাজাচ্ছিলেন, তাই তৈরি হয়ে আসতে একটু দেরি হলো। মেজমামিই ঘোষিকা। একটা ছোট্ট ধ্বনিবর্ধক যন্ত্রও জোগাড় করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরু হলো সরস্বতী বন্দনা দিয়ে। ঋক যে সংস্কৃত শ্লোক এত সুন্দর গাইতে পারে না শুনলে ধারণাই করতে পারত না সোপান। ঋজিক একটা নজরুল গীত গাইল এর পরেই। বড়মামি অবশ্য হারমোনিয়াম বাজিয়ে দিলেন। 'বল রে জবা বল / কোন সাধনায় পেলি রে তুই / শ্যামা মায়ের চরণতল।'

এটা দিদার খুব পছন্দের গান। অনুষ্ঠান জমে গেল। এরপর দেবাদ্রিতার নাচ। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে নাচল টিপ। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।' বড়মামির গলায় গানটাও সুন্দর লাগল। সঙ্গে ছোটমামার তবলা সঙ্গত। মা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আবৃত্তি করলেন। গান, কবিতা, ভাষ্য সবেতে মেজমামির অনুষ্ঠান হাততালি, হাসি, কোলাহলের মধ্যে এগিয়ে চলল।

মেজমামি বললেন, 'দিদি মেঘে ঢাকা তারা'র ওই গানটা একবার গাও না।'

বড়মামি গান ধরলেন, 'আম পাতা ঝালর ঝোলর কলা তলায় বিয়া।'

গানটা শেষ হবার পর সকলে লক্ষ্য করল দাদুর চোখে জল। সারা ঘরে কোলাহল একেবারে থেমে গেল। মেজমামা খুব নরম স্বরে বলল, 'বাবা'। দাদু এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'এই গানগুলি শুনলে দ্যাশের বাড়ির কথা মনে পইড়্যা যায়। আজও বুঝলাম না কী অপরাধে আমরা চোদ্দপুরুষের দ্যাশ ছাড়লাম।'

সকলে তখন বাংলাদেশ থেকে দাদু-দিদার এদেশে আসার কথা বলতে থাকলে। দাদুরা ওদেশ থেকে এসে ওড়িশার মালকানগিরিতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। সেখানে খুব কষ্ট। বড়মামার পরে এক মাসি ছিল। সেই মেয়েটা ওই উদ্বাস্তু শিবিরের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে। তাই মামাদের কোনও রাগ নেই। কখনও এক হলে অনেক কথার পরে এবাড়িতে অবধারিতভাবে এই আলোচনা আসবেই। সোপানের ভালো লাগছিল না। এত সুন্দর অনুষ্ঠানটা মাটি হয়ে যাচ্ছে।

সোপান একটু ইতস্তত করে বলেই দিল, 'তোমরা সবসময় ঘুরে ফিরে ওই কষ্টের দিনের কথা বলো কেন? সে তো কবেই শেষ হয়ে গেছে।'

মেজমামা খুব শান্ত স্বরে বললেন, 'কষ্টের দিনের কথা বারবার বলতে হয়। কষ্টের কারণ খুঁজতে হয়, না হলে কষ্ট আবার ফিরে আসে।'

তারপর বড়মামার দিকে ফিরে বললেন, 'জানো দাদা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের উপর অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে জার্মানি, আমেরিকায় কম করে হাফ ডজন হলোকাস্ট মিউজিয়াম হয়েছে। সেখানে ইহুদি বাচ্চারা যায়, ইতিহাসকে জানে, দেশভাগের পর থেকে পূর্ববাংলায় যে কত নরসংহার হয়েছে তার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ সংরক্ষণের জন্য আমাদের এখানেও হলোকাস্ট মিউজিয়াম হওয়া উচিত।'

বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি এলো। বড়মামী উঠে পড়ে বললেন, 'যাই রান্নার তো কিছু হয়নি। ও যশোদাদি একটু শোন...'

মা কোনও জায়গায় চলে গেলে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় সোপানের। আজ সকালে মা কলকাতায় ফিরে গেলেন। ধন্যধান্য এক্সপ্রেস ছেড়ে দিলে তরুণমামা ছোটমামাকে বলল, 'ডাক্তারবাবু আপনি চেম্বারে চলে যান, সোপান নিবাসে থেকে যাক। দুপুরে খেয়েদেয়ে ফিরবেক্ষণ।'

'দিদি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওকে হুজ্জুতি করতে দিলে আমাকে খেয়ে ফেলবে সকলে মিলে।'

'আরে না, না। ও এখন বাড়ি গেলে ভাই-বোনেদের লেখাপড়ার ডিসটার্ব করবে। বলতে হবে এর জন্য ওকে বাড়িতে পাঠানো হয়নি।'

ছোটমামা হেসে বলল, 'হুম্। বুঝেছি।'

সন্ধের নিবাসে এসে দেখল, সবাই রান্নার ব্যবস্থা করবে। নরেন, ব্রজেশ, দুর্লভ, পরিমল আর দশরথ এই ক'জন ছাত্রই এখানে থাকে। ঝটপট কেউ সবজি কাটছে, দুজন হাঁড়ি কড়াই মেজে দিচ্ছে, একজন বড় বালতিতে করে রান্নার জল তুলে আনল। এর মধ্যে রান্নার মাসি এসে গেলেন। রান্না বসে গেল। ছেলেরা রান্না আর খাওয়ার জায়গা পরিষ্কার করে স্নান করতে

চলে গেল। খানিকপরে স্নান করে পরিষ্কার জামা কাপড়ে ওরা খেতে বসল আসন পেতে। একজন পরিবেশনে মাসিকে সহযোগিতা করল। তারপর নিজেও খেতে বসে গেল। খাওয়ার পরে যে যার থালা বাসন ধুয়ে জায়গায় রেখে দিল জল ঝরিয়ে। আধঘণ্টার মধ্যে খাওয়ার পর্ব শেষ। যে যার মতো কলেজে চলে গেল। এরমধ্যে দুর্লভদা মানে দুর্লভ টুডু নাকি খুব ভালো ছাত্র। রামপুরহাট কলেজে ফিজিক্সে অনার্স পড়ে। তরুণমামার কথামতো সোপানও একটু ভাত খেল। মুসুর ডাল, পাঁচমিশালি তরকারি আর দেশি আমড়ার চাটনি হয়েছে। ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নিল সে।

কলেজের ছেলেরা চলে যাওয়ার পর তরুণমামা এসে বসল। তরুণমামা আসতেই সোপানের প্রশ্ন, 'দুর্লভদা এখানে কতদিন ধরে আছে?'

'দেড় বছর হলো। গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তি হওয়ার পর থেকে। খুব ভাল ছেলে। আশা আছে বিএসসিতে খুব ভালো করবে।'

'এত ভালো ছেলে, এখানে থাকে কেন?'

'ওর বাড়ি এমনিতে অনেক দূরে একটা বনের গ্রামে। তাছাড়া ও হলো ফাস্ট জেনারেশন লার্নেড। ওর পরিবারের কেউ কখনও পড়াশুনা করেনি। ওর বাবা আর মা দুজনেই কেন্দুপাতা কুড়িয়ে সংসার চালায়। দুর্লভ বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র।'

এই নামটাও কখনও শোনেনি সোপান।

'বনবাসী কল্যাণ আশ্রমটা কী মামা?'

তরুণমামা ধীরে ধীরে বোঝালেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে জঙ্গলে যে তপশিলি উপজাতির মানুষ থাকেন, তাদের বলা হয় বনবাসী। ইংরেজরা নিজেদের পাপ ঢাকার জন্য আর্যদের ভারত আক্রমণের তত্ত্ব প্রচলন করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ আর্য আক্রমণের তত্ত্ব মানতেন না। আজকের বিজ্ঞানীরাও মনে করেন, আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে আসেনি। আর্যরা বাইরে থেকে এসে এদেশের উপজাতিদের তাড়িয়ে, মেরেকেটে নতুন সভ্যতা স্থাপন করেছে সেই তত্ত্বই যদি মিথ্যা হয়, তবে বনে থাকা জনজাতি আদিবাসী আর বাকি ভারতীয় বহিরাগত হবে কেন? বনে থাকা ভারতীয় আমার রক্ত, আমার ভাই। তারা বনবাসী। কিন্তু বনবাসীদের অবস্থা তো খুব খারাপ। না শিক্ষা, না স্বাস্থ্য, না খাদ্য— আমাদের ওই ভাইয়েরা কত কষ্টে আছে। তাদের সেবা করে, শিক্ষায় উপার্জনে স্বনির্ভর করাই এখন প্রয়োজন। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম স্কুল বানিয়ে, প্রায় নিঃশুল্ক হোস্টেল তৈরি, কোথাও বা একজন শিক্ষকের স্কুল চালিয়ে এই কাজ লাগাতার করে যাচ্ছে। যেখানে স্কুল নেই, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের কথা মতো শিক্ষা নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে 'একল অভিযান'। মানে ওয়ান টিচার্স স্কুল। দুর্লভও ওই কল্যাণ আশ্রমের ছাত্র।

সোপান মন দিয়ে শুনছিল। সত্যি দেশের কত রকম মানুষ, মানুষের কত কষ্ট, কত মানুষের কত প্রয়োজন। কত সেবা করা যায়। মানুষের মতো মানুষ হওয়া...

'বাকি ছেলেরা কোথা থেকে এসেছে?'

'সকলেই প্রায় গরিব ঘরের ছেলে। একসঙ্গে ভাইয়ের মতো আছে। পড়াশুনা করছে, সমাজসেবা করছে।'

'তা এদের খাওয়া পড়ার খরচ কে দেয়? তোমাদের সংগঠন?'

'না। এরাই দেয়। মানে এদের দাদারা। এদের সকলেই জানে যে সব্বাইকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যেন নিজের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও একটু ভার বইতে পারে। তাই চাকরি পাওয়া বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন ছাত্রের তিন বছরের পড়াশুনা, খাওয়া, পোষাক, পরীক্ষার খরচের দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা বলি এক প্রদীপ থেকে আর একটা প্রদীপ জ্বালানো।'

'কিন্তু মামা, কেউ যদি কথা না রাখে?'

তরুণমামা হেসে ওঠে, 'আজ পর্যন্ত তো সকলেই কথা রেখেছে। ভবিষ্যতে এমন কিছু হলে দেখা যাবে। হয়তো এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে।'

তারপর একটু ভেবে বলল, 'আসলে কী জানো, বিবেকানন্দ বলতেন, মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম। মানুষের মধ্যেই তো সাক্ষাৎ দেবতা আছেন। তাই ভালো কিছু দেখলে মানুষের ভেতরের দেবতা প্রকাশিত হয়। তাই হয়তো কেউ কেউ ফাঁকি দেওয়ার কথা ভাবেই না।'

আজ সারাদিন ঠাই সঙ্ঘের নিবাসে কাটল। নিবাস মানে কার্যালয় বা অফিস। এখানে একটা ছোট্ট লাইব্রেরি আছে। ছোটদের কমিক্স, বোধকথা, হিতোপদেশ, বড় কাহিনির বই যেমন আছে, তেমনই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী আর দেশভক্তির অনেক বই। গুরুজী গোলওয়ালকরের লেখা 'চিন্তাচয়ন' বইটা সারা দুপুর ধরে পড়ল সোপান।

আজ বিকালে রামপুরহাট নগরের শারীরিক বর্গ ছিল। বিকেল ৩টে থেকেই বিভিন্ন জায়গা থেকে স্বয়ংসেবকরা আসা শুরু করল। কেউ কেউ ড্রেস পরেই এসেছিল। অনেকে নিবাসে এসে নিজের বাড়ির মতো করে সাধারণ পোশাক ছেড়ে সঙ্ঘের পোষাক পরে নিল। তরুণমামাকে এই প্রথম সঙ্ঘের পোশাকে দেখল সোপান। সাদা জামা, খয়েরি রঙের ফুল প্যান্ট, বেল্ট, মাথায় কালো টুপি আর কালো বুট জুতো। তরুণমামার চোখে

একটা চশমাও আছে। প্রথমবার দেখে একদম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কথা মনে এলো। যেন ঘোড়ার থেকে নেমে এসেছেন এইমাত্র। এই পোশাককে বলে সঙ্ঘের গণবেশ। এই গণবেশে প্রায় পঞ্চাশজন যুবক দেড় ঘণ্টা ধরে লাঠি খেলল, ব্যায়াম করল, যোগাসন অভ্যাস করল। তারপর সংস্কৃত সুভাষিত, আবৃত্তি হলো। তারপরে বুকে হাত রেখে প্রার্থনা।

'নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে....'

শারীরিক বর্গের পর সবাই ধীরে ধীরে মাঠ ছেড়ে যেতে লাগল।

তরুণমামা চেঁচিয়ে বলল, 'দশরথ এদিকে একবার আসবে।'

দশরথ লেট সামনে আসার পর তরুণমামা হাসতে হাসতে বলল, 'কি দশরথ ভালো করে অভ্যাস করেছিস তো?'

দশরথ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। তারপর কী একটু ভেবে বলল, 'দাদা, আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।'

'ধ্যুত! ভয় আবার কী? এই কাজই তো আজ করতে হবে আর সাহসের সঙ্গে করতে হবে।

আজ ধুতি পরে যাবি। আমার আলমারির দ্বিতীয় তাকে আছে নিয়ে আয়। ঝকাস করে পরিয়ে দিচ্ছি।'

সোপানের খুব আগ্রহ হলো। কোথায় যাবে এরা? কী এমন সাহসের কাজ?'

একবার সাহস করে বলেই ফেলল, 'কী গো মামা? কোথায় যাবে তোমরা?'

তরুণমামা কী একটা ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আজ আমরা সমাজের একটা অসুখের ট্রিটমেন্ট করতে যাচ্ছি। সেদিন তোমার মামার বাড়িতে দশরথের এক পংক্তিতে খাওয়া দেখে আমার মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল।'

সোপানের অনুরোধের পরে তরুণমামা পরিকল্পনার কথা বলল। এখান থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম চণ্ডিপুর। সেখানে একটি শিবমন্দির আছে। বহু পুরাতন মন্দির। নাম ভৈরবেশ্বর মন্দির। চণ্ডিপুরের ভট্টাচার্য বাড়ির পারিবারিক মন্দির। কিন্তু খারাপ ব্যাপার হলো, ওই মন্দিরে আজও নীচু জাতির মানুষের প্রবেশ নেই।

এই পরিবারের দুই জমজ ভাই এখন প্রতিদিন সঙ্ঘের শাখায় আসে। দুজনে একসঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে। এইসব

প্রশিক্ষণবর্গ একুশ দিনের হয়। সেখানে ব্যায়াম, লাঠি, ক্যারাটে এমন প্যারা মিলিটারি ট্রেনিংয়ের সঙ্গে দেশভক্তির পাঠ দেওয়া হয়। ওরা ক্যাম্প থেকে ফিরেই নিজেদের পরিবারে এমন মধ্যযুগীয় কুপ্রথা বন্ধ করে দিতে চায়। ভৈরবেশ্বর মন্দিরে সবাই যেন ঢুকতে পারে। কিন্তু রাজি হচ্ছেন না ওদের জেঠু। জেঠু নিজে একটা স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত, শিক্ষক ছিলেন। তরুণমামার পুরো নাম তরুণ মুখোপাধ্যায়, মানে ব্রাহ্মণ, তাই তরুণমামাকে খুব পছন্দ করেন জেঠু। তাই শেষ যেদিন গিয়েছিল তরুণদাকে সূত্রধরের কথা বলেছিলেন। সূত্রধর পুজোর সময় স্তোত্রপাঠ করেন।

সব শুনে সোপান বলল, 'আমিও যাব।'

'একদম নয়।' পরিষ্কার উত্তর দিল, 'তুমি যেতে পারবে না, তোমার ছোটমামা এখনই আসবে তোমাকে নিতে।'

কিন্তু সোপান নাছোড়বান্দা। 'আমি যাব। প্লিজ, দেখব গিয়ে ওখানে।'

শেষে কিছুটা বাধ্য হয়েই ছোটমামাকে ফোন করল তরুণমামা। 'এই যে ডাক্তার, তোমার ভাগ্নে কথা শুনছে না। আমাদের সঙ্গে চণ্ডিপুরে যাবে বলছে। কী করব?'

তারপর অনেকক্ষণ কথা হল। মাঝে একবার তরুণমামা বলে উঠল, 'আরে আমি তো বারণই করছি। ধ্যুত বাবা!' সবশেষে বোঝা গেল অনুমতি পাওয়া গেছে।

বুঝে সোপান একটু নেচে নিল, 'ইয়াহ্, যাবই যাব, যাবই যাব।'

চণ্ডিপুরের ভট্টাচার্য বাড়ির যে দুটি ছেলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, বদ্রীপ্রসাদ ওদের নিতে এসেছিল। মোট দুটো বাইকে ওরা চারজন পৌঁছল সেই দ্বাদশ শিবমন্দিরে। একটা বিরাট ঝিলের ধারে ওই বারোটি শিবমন্দির। মাঝখানে একটি বড় মন্দির, তার দুই পাশে বাকি মন্দিরগুলি।

মন্দিরের পাশেই বাড়ি। পুরাতন দুই মহল্লার বাড়ি। বৈঠকখানা ঘরে বসেছিলেন রামরতন ভট্টাচার্য, বদ্রীপ্রসাদ আর কেদারপ্রসাদের জ্যাঠাবাবু। তরুণমামা ঘরে ঢুকতেই জেঠু বলে উঠলেন, 'আরে মুখুজ্জেবাবু যে, এসো এসো। আসতে আজ্ঞা হোক।'

তরুণমামা এগিয়ে জেঠ্যুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। সোপান, দশরথও দেখাদেখি পায়ের ধুলো নিল।

'হ্যাঁরে বদ্রী, মুখুজ্জের জন্য চা বলেছিস? জেঠিমাকে জিজ্ঞাসা কর তো একটু সাবুর পাপড় আর শুকনো খোলায় বাদাম ভেজে দিতে পারবে কিনা?'

সকলে মিলে জেঠুর সামনে পুরাতন বড় বড় সোফাতে বসল।

'জেঠু এই আপনার সূত্রধর আনলাম। সামনের রুদ্রাভিষেকের দিন এ আপনার মন্দিরে স্তোত্রপাঠ করবে। ও এখনও ছাত্র, তবে আপনি বললে সময় সময় এসে যাবে।'

'বাঃ বাঃ! খুব ভালো। তা বাবা একটু শোনাও তো দু-একটা শ্লোক।'

'জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের শিবাষ্টক শ্লোক শোনাই?'

এই প্রথম কথা বলল দশরথ।

'খুব ভালো। আদি শঙ্করাচার্যের শিবমহিমা আর শিবাষ্টক শ্লোক তো অসাধারণ।'

দশরথ পরম ভক্তিভরে শুরু করল,

'প্রভুশীশ মনীশ মহেশ গুনম্...'

অসাধারণ আবৃত্তি করছে দশরথ। পুরো বৈঠকখানা ঘর গমগম করছে।

'অসাধারণ বাবা, অসাধারণ হয়েছে। আর কিছু শোনাও।'

দশরথ আবার শুরু করল।

'কা তব কান্তা কস্তি পুত্রাঃ / সংসারহম অতীব বিচিত্রম্...'।

এর মধ্যে যখন 'ভজ গোবিন্দম্ / ভজ গোবিন্দম্ গোবিন্দম্ ভজ মূঢ়মতে...' এই অংশটা এল তখন জেঠু একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন। অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'বাঃ বাঃ!'

শ্লোক পাঠ শেষ হলে জেঠু তরুণমামাকে বলে উঠলেন, 'মুখুজ্জে, তুমি তো এক টুকরো রত্ন নিয়ে এসেছ। বড় ভালো লাগল হে শুনে।'

চা, পাপড় আরও কিছু খাবার নিয়ে এলো বদ্রীর ভাই কেদারপ্রসাদ। দুই ভাইও বসল আসরে।

একটা পাপড়ে কামড় দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন, 'তা বাবা কী নাম বললে তোমার?'

'দশরথ।'

'দশরথ? বাঃ ভগবান রামচন্দ্রের বাবার নাম। পুরো নামটা কি?'

'দশরথ লেট।' এই উত্তরটা তরুণমামা দিল।

'দশরথ লেট?' আঁতকে উঠে বলে উঠলেন জ্যাঠাবাবু। হাতের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন।

কিছুক্ষণ একদম চুপ। একটা পিন পড়লেও বোধহয় শোনা যাবে।

তারপর নিস্তব্ধতা ভেঙে রমরতন ভট্টাচার্য বললেন, 'এটা তোমরা কী করলে? ভৈরবেশ্বর মন্দিরে কোনও অন্ত্যজের প্রবেশ নেই। এ আমাদের ঐতিহ্য। বাবা ভৈরবেশ্বর এখনও কোনও নীচ জাতির স্পর্শ পাননি।'

বদ্রীপ্রসাদ বলে উঠল, 'জেঠু, এটা আমাদের ঐতিহ্য নয়, এটা আমাদের লজ্জা।'

'কী? কী বললে? আমাদের বাবা-জেঠার সামনে এমন কথা বললে, বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হতো। যত অধার্মিক কুলাঙ্গার জন্মেছে এই বংশে!'

কেদারপ্রসাদ মিতভাষী। ও এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বলল, 'আমরা কেউ অধার্মিক নই। বাবা ভৈরবেশ্বরের উপর আমাদের অগাধ শ্রদ্ধা। কিন্তু প্রতিবারই রুদ্রাভিষেকের সময় যখন অন্তজরা মন্দিরের দালানে পূজার সামগ্রী দিয়ে চলে যায়, আমার মনে হয় মন্দিরের দেবতাও যেন তাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেলেন।'

'কী বলতে চাও তোমরা? আমি তো ভাবতেই পারছি না।'

বদ্রী আর কেদার দুজনে জেঠুর দুই হাত ধরে বলল, 'জ্যাঠামণি, এ বড় পাপ। এই পাপেই ভারতের কত বড় বড় মন্দির বিদেশী আক্রমণকারীরা লুণ্ঠন করে, অপবিত্র করে, ভেঙে দিয়েছে। হিন্দু সমাজ জাতিভেদ ভুলে এক হয়ে লড়তে পারেনি। আমাদের ইচ্ছা...।'

জেঠু কোনও কথা না বলে হাতদুটো ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'মুখার্জিবাবু, আপনারা চা পান করে নিন, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।'

জেঠু কখনও আমাকে 'আপনি' বলেন না। তরুণমামার মুখটা একদম ছোট হয়ে গেছে। 'যাক চলো! চেষ্টা তো করা হলো। সফল হওয়া না হওয়া তো বাবা ভৈরবেশ্বরের হাতে।'

সকলেই মাথা নীচু করে বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটা মোটরবাইকে তিনজন যেতে পারবে না। তাই পৌঁছানোর জন্য কেদার বা বদ্রীকে কারোকে যেতেই হবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হবে তার ব্যবস্থা চলছে। পুজোর বাসন নিয়ে, ফুল চন্দন প্রসাদ নিয়ে মায়েরা একে একে মন্দিরে ঢুকছেন।

ওইদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোপান বাইকের পেছনে বসল।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে সবার বুকে মধ্যে ড্রাম বেজে উঠল। 'এই যে ছেলে, কী নাম যেন তোমার? দশরথ? দশরথ এদিকে এসো।'

দশরথ ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল। দাঁড়াল রামরতন

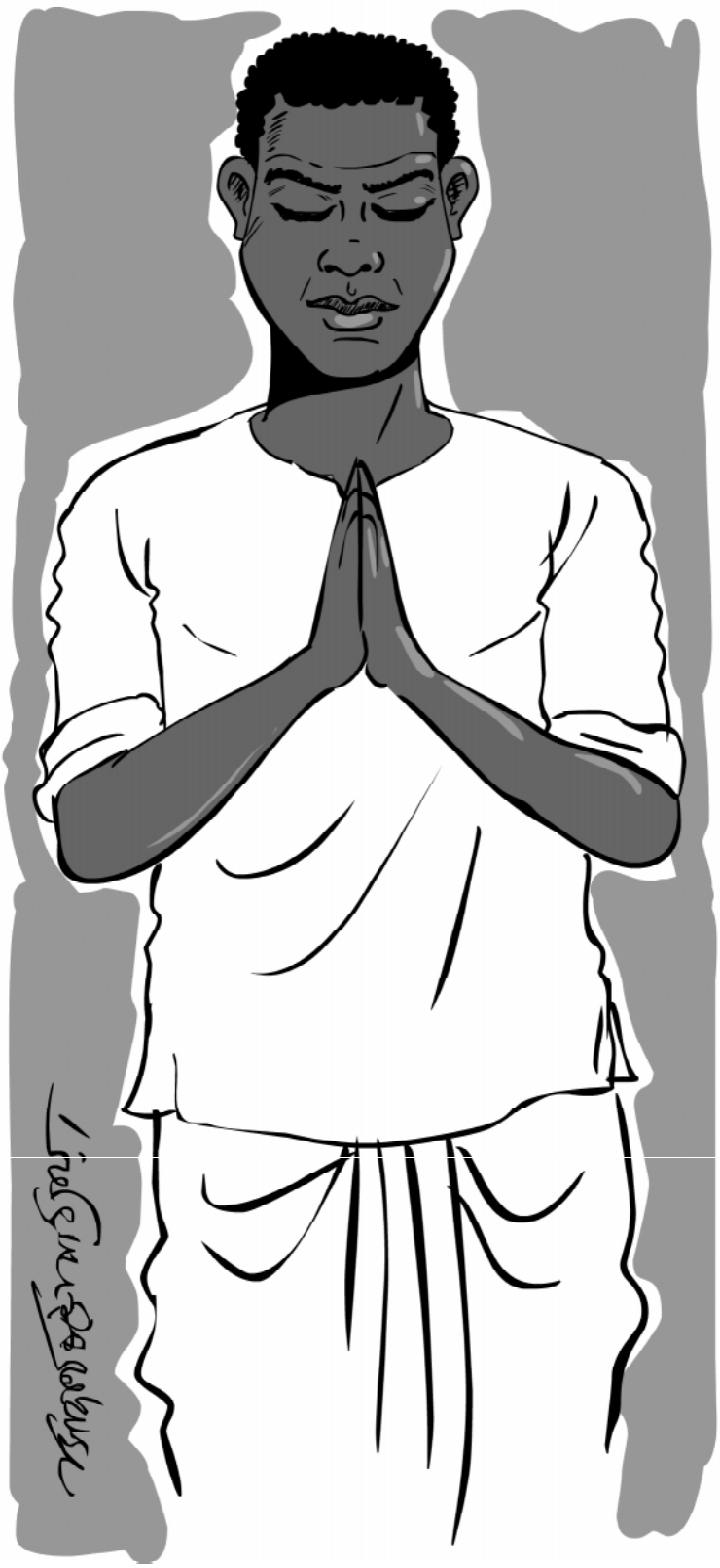

ভট্টাচার্যের সামনে। জেঠু গম্ভীরভাবে বললেন, 'তুমি চলে যাচ্ছ যে বড়ো? এখুনি ভৈরবেশ্বরের আরতি শুরু হবে। তুমি এসো আমার সঙ্গে। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করবে ১০৮ বার।'

সোপানদের দল নাচতে নাচতে মন্দিরে ঢুকল।

ভৈরবেশ্বর শিবলিঙ্গের সামনে বসে দশরথ। গাইছে—

'ওঁ ত্র্যম্বকম্ যজামহেৎ সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং
উর্বরুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃত্যাৎ।।'

এত সুন্দর উচ্চারণ, গলার এত গম্ভীর মধুর স্বর মন্দির যেন থরথর করে কাঁপছে।

স্তোত্রপাঠ শেষ হলে বদ্রীর জ্যাঠামণি উঠে এসে দশরথকে জড়িয়ে ধরলেন। জ্যাঠামণির দুচোখে জল। সোপান অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করল, দশরথও কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্না আর থামছেই না।

আজ থেকে ক্যাম্প শুরু। গত দুদিন ধরে সোপান উত্তেজনায় ফুটছে। পরশুদিন দিদির সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল। সোপান কোনও বিশেষ কথা দিদিকে না বললে মনটা ভরে না। প্রথম দুদিন এতকিছু ঘটেছে যে দিদিকে ফোনই করা হয়নি। প্রথমে দিদি অভিমানে কথাই বলছিল না। কেবল হ্যাঁ, হুঁ বলে উত্তর দিচ্ছিল। সোপান কিছুটা বুঝতে পেরে বলল, 'তোর কি শরীর অসুস্থ দিদিভাই?'

ওদিক দিয়ে উত্তর এল, 'দিদিভাই? ওঃ তোর একটা দিদি আছে, সেটা এখনও মনে আছে তাহলে?' তারপর সোপানকে দিদিকে জানানোর সব অস্ত্র প্রদান করতে হলো। সেই থেকে ঠিক করেছে, যত কিছুই হোক না কেন রোজ রাত্রে অন্তত একবার দিদিকে ফোন করবেই।

গতকাল রাতে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলল সোপান। গতকাল সকালে তরুণমামার সঙ্গে রামপুরহাট রেল মাঠের এক শাখাতে গিয়েছিল। ওই সকালের শাখায় রোজ দুটো ছেলে আসে। অরুণ দাস আর বরুণ দাস। ওরা রেললাইনের ধারে একটা বস্তিতে থাকে। প্রায়ই শাখার শেষে ওরা বায়না করে তরুণমামাকে ওদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। কালকে ও বলছিল, তরুণমামার কাল মেডিক্যাল ক্যাম্পের জন্য সকালে ব্যবস্থা বৈঠক ডেকেছিল। শিবিরে খাওয়া, জল, পাহারা, আলো, শোয়া-থাকার ব্যবস্থাতে যে সব স্বয়ংসেবক মানে স্বেচ্ছাসেবক থাকবে তাদের মিটিং। তাই অরুণ-বরুণকে তরুণমামা বলল, 'এখন নয়, দুপুরে তোদের বাড়িতে খাব। আমার সঙ্গে এই দাদাটাও থাকবে।'

কিন্তু শাখার মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেই তরুণমামার মনটা খট্‌খট্ করছিল। বলল, 'কাজটা বোধহয় ঠিক হলো না। অরুণের বাবা ট্রেনে টয়লেট সোপ বিক্রি করেন আর ওর মা লোকের বাড়িতে কাজ করেন। তাই একবার আগে গিয়ে দুপুরের খাওয়ার কথা বললে হোত। কিন্তু আর তো কিছু করার উপায় ছিল না। বৈঠক শেষ করার পর স্নান করে ওরা রেলপাড়ের বস্তিতে পৌঁছাল। ওদের বাড়ি খুঁজতে একটু সময়ও লাগল। বাড়ি মানে ছোট টালির ঝুপড়ি ঘর। সেখানে পৌঁছে দেখল দুই ভাই বাইরে মার্বেল খেলছে। তরুণমামাকে দেখে বড় ভাই অরুণ কেমন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। ওর ছোট ভাই বরুণ কিন্তু চিৎকার করতে করতে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। অরুণও একটু আমতা আমতা করতে করতে ওদের নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে বসাল।

অরুণ বলল, ওর মা কারও বাড়িতে কাজে গেছেন। যাই হোক, একটু পরে মাটির মেঝেতে দুটো ছোট চাটাই পেতে ওদের খেতে দিল বড়ভাই অরুণ। দুটো থালায় ভাত, দুটো ছোট বাটিতে পাতলা ডাল আর সঙ্গে দুটো প্লেটের মধ্যে অর্ধেক করে কাটা ডিমের ঝোল।

ওদের দুজনকে খেতে দেওয়ার পর তরুণমামা বলল, 'তোদের খাবারটাও নিয়ে আয়। একসঙ্গে খাবো তো।'

অরুণ বলল, 'আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।'

তরুণমামার কিরকম সন্দেহ হলো। মামা ছোট ভাই বরুণকে একটু ধমকের সুরেই বলল, 'কী রে কখন খেয়েছিস তোরা?'

বরুণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, 'খাইনি তো! এগুলোই তো আমাদের খাবার।'

তরুণমামা একটু সময় একেবারে চুপ হয়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হাড়িতে একটু জল চাপা, আমি এক্ষুনি আসছি।'

বাইক নিয়ে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ১ কেজি চাল, একটু আলু আর চারটে ডিম নিয়ে এল তরুণমামা। জল তো গরম হয়েই ছিল। ঝটফট চাল, আলু আর ডিম সেদ্ধ হয়ে গেল। তারপর সবার পাতেই একটু একটু ডাল আর অল্প অল্প অরুণের মায়ের রান্না করা ডিমের ঝোল। তারপর হাতজোড় করে মন্ত্র পাঠ হলো।

'ওঁ সহনাববতু, সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্যং করবাবহৈ
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।'

আমরা পরস্পরকে রক্ষা করব, দেশে যেন কেউ অভুক্ত না থাকে। একসঙ্গে আমাদের শৌর্য প্রদর্শন করব। আমাদের অধ্যয়ন তেজস্বী হোক। কেউ যেন কারোর দোষ না দেখে। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

তখন অরুণ আর বরুণের আনন্দভরা মুখমণ্ডল দেখার মতো। আর সোপানের মনে হচ্ছিল এত সুস্বাদু খাবার ও জীবনে কখনও খায়নি।

কথাগুলো বলতে বলতে সোপানের মনে হল দিদি অন্যদিক থেকে কোনও উত্তর করছে না। লাইটা কি কেটে গেল?

'দিদি! শুনছিস?'

'হুম, বল।'

'তুই কাঁদছিস কেন?'

'না। তুই আর রাত জাগিস না। শুয়ে পড়।'

ধরা ধরা গলায় বলে দিদি ফোন রেখে দিল।

আজকের ক্যাম্প হবে তারাপুর সরস্বতী শিশুমন্দিরে। সকালে ছোটমামার সঙ্গেই চলে এসেছিল সোপান। বর্গ শুরু হবে সকাল ৯টায়। তার আগে যারা ট্রেনিং নেবে সবাই সকালের জলখাবার করে এক এক জন করে হলের মধ্যে ঢুকছে। সরস্বতী বন্দনা আর প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুরু হলো অনুষ্ঠান। অবাক করার মতো বিষয় হলো এই সব ব্যবস্থায় আছে একদম অল্প বয়সের ছেলেরা। সকালে খেতে দিচ্ছিল দুজন কলেজের ছেলে। হলের ভেতরে ঘোষণা যে ছেলেটি করছে সে ইংরাজিতে অনার্স কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। অতিথি বরণ, গান— সবই করছে যুবক ছাত্ররা। একদম ঘড়ির কাঁটায় ন'টায় শুরু হলো অনুষ্ঠান।

ছোটমামা আর অধ্যাপক ডাক্তার ভদ্র যখন ড. শ্রীকান্ত গাঙ্গুলী নাম ডেকে একটা অপূর্ব সুন্দর উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেওয়া হলো, তখন ছোটমামার জন্য সোপানের খুব গর্ব হচ্ছিল। প্রথম উদ্বোধনী কার্যক্রমে কেবল ড. ভদ্র সামান্য উৎসাহবর্ধক কথা বললেন। বোঝালেন, আজকের ব্যস্ত সমাজে এই আপদকালীন স্বাস্থ্য সেবার কত ভীষণ প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দকে আদর্শ করে নিজের জীবন গঠনের কথাও বললেন। তারপর পনের মিনিটের একটা ব্রেক। সঙ্গে চা। পরের সত্র আপদকালীন স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন ভাগের কথা বলা হলো। এই সেশনটা নিল ছোটমামা। ছোটমামা ডাক্তারির গভীর বিষয়গুলো এত সহজে ছেলেদের সামনে রাখল যে ভীষণ গর্ব হতে লাগল সোপানের।

ছোটমামার বলার পরে দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা। এই সরস্বতী শিশু মন্দিরে একটা বড় রান্নাঘর আছে। স্কুলের মিড-ডে মিল রান্না হয়, সেই সঙ্গে সামান্য কয়েকজন অনাথ ছেলের ছাত্রাবাস আছে। তাদের জন্য রান্নার ব্যবস্থা একেবারে অভিনব। রান্না হয় ধানের তুষের আগুনে। একদিক থেকে তুষের জ্বাল দিলে বিশেষ ভাবে তৈরি উনোনে একটা লম্বা অংশে দুটো বড় হাঁড়ি আর একটা ছোট পাত্র বসানো যায়। উনোনটার অন্যদিকে ইটের তৈরি এক লম্বা চিমনি রান্নাঘরের বাইরে বের হয়ে গেছে। এই এতবড় উনোনে একটুও ধোঁয়া নেই।

যারা পরিবেশন করবে তারা রান্নাঘরে চলে গেল। পাঁচজন করে দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল ওরা। একজন ডাল, একজন আলুকুমড়ো ভাজা, একজন পাঁচমেশালি সবজি আর একজন চাটনি। আর সোপানের দায়িত্ব পড়ল সবাইকে জল আর নুন দেওয়ার। এই সবটাই করে ফেলল সোপানের থেকে একটু বড় দাদারা।

সবাই মাটিতে পঙতিতে বসে খেল। সবাইকে পরিবেশন শেষ হলে তবেই ভোজনমন্ত্র বলা হলো। তার আগে একজনও খেল না। মন্ত্রের পর সবাই একসঙ্গে খাওয়া শুরু করল। এই দৃশ্য দেখে ডা. উজ্জ্বল ভদ্র তো একেবারে মোহিত। বারবার বলতে লাগলেন, 'ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল। আন বিলিভেবল্!'

খাবার পরে সবাই ভেবেছিল, এবার হয়তো শিক্ষার্থীদের একটু তন্দ্রা আসবে। কিন্তু এর পরেই হাতে কলমে ব্যান্ডেজ করা শেখানো হলো। কতরকমের ব্যান্ডেজ। সেগুলো কখন কীভাবে ব্যবহার হয় সেসব আকর্ষণীয় ভাবে দেখানো হলো। ঘুম তো দূরের কথা, কারও চোখে পলক পড়ছিল না। শেখাচ্ছিলেন রবীনদা আর পরমানন্দজী। দুজনেই কলকাতা থেকে এসেছেন। সবশেষে দেখালেন যে দুটো জামা আর দুটো দণ্ড বা লম্বা লাঠি দিয়ে কিভাবে ঝটপট স্ট্রেচার বানানো যায়।

সারাদিন একটার পর একটা ট্রেনিং দেওয়া হলো। রাতে খাবার পরে শোয়ার সময় মেঝেতে ছোট ছোট তোষকের মতো ম্যাট পাতা। সবাইকে মশারি আর চাদর আনতে বলা হয়েছিল। নিজের নিজের বিছানা করে সব শিক্ষার্থী শুয়ে পড়ল। ঠিক রাত ১০টায় দীপ নির্বাপণ হয়ে গেল। এত জন শিক্ষার্থী ব্যবস্থার কাজে নিয়োজিত প্রবন্ধক এতজনের কলকোলাহল একেবারে শান্ত হয়ে গেল।

সকাল ৪টের সময় জাগরণ। এত সকালে ওঠার কথা ভাবতেই পারে না। কিন্তু সকলেই উঠে গেল। তাই সোপানও ধীরে ধীরে উঠে আস্তে আস্তে বিছানা গুছিয়ে রাখল। টয়লেটে গিয়ে দেখল আগে থেকেই অনেকে উপস্থিত আছে। তরুণমামা নিজে দাঁড়িয়ে ছিল, কারোর গরম জল বা কিছু লাগবে কিনা?

কিন্তু একটু পরেই চলে গেল। সবাই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সকালের কাজ সেরে পরিষ্কার হয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ঝটপট প্রস্তুত হয়ে বের হলো। সব কাজ বড়দের মতো নিজে নিজে দায়িত্ব নিয়ে করতে পারল সোপান। নিজের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস উপলব্ধি হচ্ছিল।

সকালে সবচেয়ে প্রথমে প্রাতঃস্মরণ করল। সেই প্রাচীন ঋষি থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু পর্যন্ত একের পর এক ক্ষণজন্মা মনীষীর নাম সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে আবৃত্তি করল সময়ে। এরপরে পাক্কা আধঘণ্টা যোগাসনের ক্লাস হলো। এর পরে সকালের খাওয়া, গরম গরম ইডলি আর ধোঁয়াওঠা সম্বর দেওয়া হলো। প্রাতঃরাশ খেয়ে সকলে প্রথম সত্রে বসল।

তারপর থেকে একটার পর একটা বিষয় বলে চললেন ডাক্তারবাবুরা। কালকের মতোই হলো দুপুরে ভোজন। আজ আরও জোরদার। আম আর মিষ্টি দইও দেওয়া হলো।

বিকেলের শেষ অনুষ্ঠানে বুদ্ধদেব মণ্ডল নামে আরোগ্য ভারতীর এক দাদা 'আরোগ্য মিত্র' নামে এক প্রকল্পের কথা জানালেন। যেসব গ্রামে চিকিৎসার সুবিধা এখনও পৌঁছায়নি, সেখানে কাজ করে আরোগ্য মিত্র। আমাদের দেশের অবস্থা, এই রাজ্যের অবস্থা আর লক্ষ লক্ষ গ্রামের মানুষ আমাদের মতো শিক্ষিত মানুষের কাছে কি আশা করে, বুদ্ধদেবদার কথা একেবারে মনকে ছুঁয়ে গেল। বলার শেষে উপস্থিত ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, এর মধ্যে কে কে গ্রামে গিয়ে ডাক্তারবাবুদের নির্দেশমতো স্বাস্থ্যসেবার কাজ করতে পারবে। মোট পাঁচজন হাত তুলল। উনি তাদের নাম, ফোন নম্বর নিয়ে নিলেন।

আজ শেষের অনুষ্ঠানের ঠিক আগে একটি ছেলে দারুণ একটা গান গাইল।

'ওরে নূতন যুগের ভোরে
দিসনে সময় কাটিয়ে বৃথা
সময় বিচার করে,
ওরে নূতন যুগের ভোরে।'

পুরো শিবির শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও গানটা মনের মধ্যে অনুরণিত হতে থাকল। সোপান বারবারই আপনমনে গেয়ে উঠছে।

তারপর সরস্বতী শিশুমন্দির থেকে যখন মামা-ভাগ্নে বের হলো, তখন বিকেল ৪টে বাজে। বাইরে এসেই মামা বললেন, কাছেই একজন পেসেন্ট থাকেন। গতদিন খুব অসুস্থ ছিল। তাই একবার দেখতে যাবে। ভদ্রলোক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। অবসরের পরে নিজের গ্রামে ফিরে সুন্দর বাড়ি করেছেন, বাড়ির নাম তাই 'অবসর'।। অবসর সত্যিই খুব সুন্দর। দেবদারু আর ঝাউ গাছের মাঝে মোরামফেলা রাস্তা। সোপান বাইরের ঘরে বসল, ছোটমামা পেশেন্ট দেখতে গেলেন। একটু পরেই ছোটমামা বের হয়ে এসে মোবাইলটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ধর, তোর দিদি ফোন করেছে।'

ফোনটা ধরে সোপান বলল, 'দিদি, বল!'

ওদিকে তুলি খুব উত্তেজিত, 'আমি সেবিকা সমিতিতে আজ জয়েন করলাম। অনলাইনেই করা গেল। আজ ওখান থেকে একটা মেয়ে এসেছিল। আমার কলেজের কাছেই ওদের একটা সাপ্তাহিক মিলন চলে। সেদিন অরুণ-বরুন দুই ভাইয়ের কথা তোর কাছে শুনে মনটা বড় ভারী হয়েছিল। সত্যি, নিজের জন্য বাঁচা আবার বাঁচা নাকি?'

অনেকক্ষণ কথা হলো ভাই বোনের। দিদি অভিমানের সুরে বলল, 'সেই কবে গেছিস? মা ফিরে এলো, তোর আসার নাম নেই। আসতে ইচ্ছে করে না, না? সাপের পাঁচপা দেখেছ, এখন আর তোমাকে কে পায়?'

'এই তো সবে এলাম। অমন হিংসুটেমি করিস কেন রে দিদি?'

বলতে বলতে ছোটমামা বের হয়ে এলেন। সোপন বলল, 'ঠিক আছে। মাকে বাবাকে বলে দিস। বিন্দাস...'

ওদিক থেকে আবার ধমক, 'কি? বিন্দাস! মুখের বুলিও পাল্টে গেছে। মা, ও মা! শুনছো তোমার ছেলের মুখের বাণী। ও মা...'

সোপান কথা না বাড়িয়ে ফোনটা কেটে দিল।

ছোটমামা বলল, 'চল্, আজ রথীনবাবু ভালো আছেন। বাড়ির দিকে এগোই।' বলতে বলতে রথীনবাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। 'সেকি! ডাক্তারবাবু আজ ভগ্নেকে নিয়ে এসেছেন। এক কাপ চা তো খেয়ে যান।'

ছোটমামা আগেই বলেছেন, বাঙালি রোগীদের একটা কুসংস্কার আছে যে, ডাক্তারবাবু পেশেন্টের বাড়িতে কিছু খেলে রোগ ভাল হয় না। তাই জেনেশুনেই ছোটমামা পেশেন্টের বাড়িতে কিছু খেতে চায় না।

'না, মাসিমা। একটু তাড়া আছে। আর একদিন নাহয়...'

'না, না। আজই। ভাগ্নেটিকে নিয়ে কি আর আপনি রোজ আসবেন? আর বঝেছি, আপনি কেন ইতস্তত করছেন। আমাদের ওসব কুসংস্কার নেই। তাছাড়া পেশেন্ট তো এখন সুস্থই।'

অগত্যা বসতে হলো। গোলাপখাস আম, সরভাজা আর বেসনের পাপড়া। তারপর চা।

ছোটমামার ফোন বাজছে। সোপান দেখতে পাচ্ছে, নাম

ভেসে আসছে 'তরুণদা প্রচারক।' সোপান ইঙ্গিত করল, মামাও ইশারাতে বোঝালো, 'দেখেছি।' চায়ের কাপ নামিয়ে নিজেই ফোন করল। ওদিক থেকে কিছু শোনার পর ছোটমামার চোয়াল কঠিন হয়ে গেল, 'আচ্ছা, এক্ষুনি আসছি।'

রথীনবাবুদের থেকে বিদায় নিয়ে বাইকে উঠতে উঠতে ছোটমামা বললেন, 'উঠে বস।'

বাইক স্টার্ট হলো। সোপান প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাচ্ছি?'

'সঙ্ঘের নিবাসে। আরজেন্ট কল এসেছে।'

রামপুরহাটের দিকে ছুটে চলল মামার মোটবাইক।

সঙ্ঘ নিবাসে এসে দেখে প্রায় তিরিশ-চল্লিশজন স্বয়ংসেবক এসে গেছে। তরুণমামা বলে উঠল, 'এইতো, ডাক্তারবাবুর জন্যই সবাই অপেক্ষা করছে।' তারপর সোপানের দিকে চোখ যেতেই বলল, 'এ বাবাঃ ভাগ্নেকে নিয়ে এলে কেন? তোমরা সেই বিকেল থেকে এখনও বাড়ি ফেরোনি?'

মামা বাড়িতে ফেরাতে দেরি হওয়ার কারণ বলল। তারপর বলল, 'কিন্তু কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে বিরাজ তোমায় যেতে যেতে বলবে। অধ্যাপক মণ্ডল আর অ্যাডভোকেট চণ্ডীদা এতক্ষণে থানায় পৌঁছে গেছেন। তোমরা অফিসারের সঙ্গে কথা বল গিয়ে। আমি ভাইপোকে বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি।'

ছোটমামাকে নিয়ে বিরাজদারা বের হয়ে গেল। একজন দুজন করে দলে দলে স্বয়ংসেবক নিবাসে আসছে। এখন সংখ্যাটা একশ ছাড়িয়ে গেছে। সোপান আস্তে আস্তে দশরথের কাছে গিয়ে বলল, 'কী হয়েছে গো দশরথদা?'

দশরথ যা বলল, তাতে ওর হাড় হিম হয়ে গেল। গণপুরের জঙ্গলে বেশ কিছুদিন থেকেই ডাকাতের উপদ্রব বেড়েছে। পুলিশকে অনেক বলার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি। আজ তারাপুরের বনমালীদা বউদিকে ডাক্তার দেখিয়ে সন্ধ্যা সন্ধ্যা নাগাদ গণপুরের জঙ্গলের পাশ দিয়ে আসছিলেন। ওদের হঠাৎ দাঁড় করিয়ে বউদির গলার হার আর দুল খুলে দিতে বলে। বনমালী আর বৌদি দুজনেই খুব সাহসী। ওরা কিছুতেই সোনাদানা দিতে চায়নি। তখন বনমালীদার হাতে ডাকাতরা ভোজালির কোপ মারে।

সেই অবস্থাতেও লড়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দুজন দুষ্কৃতী ধরে বৌদির গলার হার খুলে নেয়। দুটো কানের লতি ছিঁড়ে দুল নিয়ে নেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যায় বৌদি। এর মধ্যে পেছন থেকে দুটো গাড়ি এসে পড়ে। তখন ওরা বৌদিদের টেনে হিঁচড়ে জঙ্গলে ঢুকিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। বৌদিকে টেনে নিচ্ছিল, বউদি ডাকাতের হাতে সজোরে কামড়ে দিয়েছিল। তাই তাড়াতাড়িতে রাস্তার ওপর ফেলে পালিয়ে যায়। ওই পেছনের গাড়ি বৌদিকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। রামপুরহাটের নর্সিংহোমে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয়।

সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে যে থানা থেকে কী খবর আসে। তরুণমামার পরিকল্পনা মতোই একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক, একজন অধ্যাপক আর একজন চিকিৎসক মানে ছোট মামাকে পাঠানো হয়েছে থানাতে কথা বলার জন্য। গণপুরের জঙ্গলে এই ক্রমবর্ধমান সমাজ-বিরোধীদের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে সমাজের শিক্ষিত সমাজে সচেতনতা বোঝানোর জন্যই এই চিন্তা করা হয়েছে। এদিকে সঙ্ঘ নিবাসেও সমবেত হয়ে গেছে অনেক মানুষ। স্বয়ংসেবকরা তো এসেই ছিল, এখন জড়ো হয়েছেন কাতারে কাতারে সাধারণ মানুষ।

হঠাৎ তরুণমামার খেয়াল হলো, সোপানকে বাড়ি পাঠাতে হবে। তাই বলে উঠলেন, 'বীরেশ্বর ডাক্তারবাবুর ভাগ্নেকে একটু বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। বাইক নিয়ে বেরিয়ে যা।'

সোপান মৃদু প্রতিবাদ করে বলল, 'আমি এখন যাব না...'।

তরুণমামা প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, 'না, তুমি ফিরে যাবে আর এখুনি যাবে।'

কথা শেষ হতে না হতেই আবার ফোন এলো। এবার থানাতে যারা গিয়েছিলেন, তারা খবর দিলেন যে, থানায় কোনও অফিসার এখন নেই। সেই কারণে পুলিশ এখনই কোনও ব্যবস্থা নিতে পারবে না।

আবার সকলে একটু আলোচনা করে নিল। এদিকে বনমালীদার ফোনে এতক্ষণ রিং হচ্ছিল, এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। মল্লারপুর থেকেও স্বয়ংসেবকরা এগিয়ে আসছে গণপুরের দিকে। ঠিক হলো, বনমালীদাকে বাঁচাতে নিজেরাই এগিয়ে যাওয়া হবে।

নিবাসে জড়ো হওয়া সবাই বের হয়ে এলো। গন্তব্য গণপুরের জঙ্গল। সবাই এক এক করে মোটর বাইকে উঠে বসল। রবীন্দ্র আগরওয়ালজী আর বৈদ্যনাথবাবুর চারচাকার গাড়িও এসে গিয়েছিল। সোপান গুটিগুটি বীরেশ্বরদার বাইকে না উঠে বিরজদার পেছনে উঠে বসল।

বিরাজদা পেছনে একজন উঠেছে দেখেই মোটরবাইক ছেড়ে দিল। গাড়ি ছুটে চলল গণপুরের দিকে। একটু পুরে বিরাজের বোধহয় খেয়াল হলো সোপান বসে আছে পেছনে। 'এই সোপান, তোমার তো বাড়ি ফেরার কথা। তুমি যাওনি?'

'আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।'

'কক্ষনো নয়। তরুণদা ভীষণ রাগ করবে।'

কিন্তু অন্য বাইকগুলো ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিরাজ একটু দাঁড়িয়ে গিয়েও আবার স্টার্ট দিয়ে দিল।

গণপুরের জঙ্গলের সামনে পৌঁছে দেখল, মল্লারপুরের লোকেরা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। স্বয়ংসেবকরা হাতে বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে এসেছে। শক্তিশালী কিছু টর্চও এনেছে। কাছেই শিবপাহাড়ি। বহু পুরাতন এক শিবমন্দির আছে। ওই গ্রামে প্রচুর বনবাসী থাকেন। ওই গ্রামের মাঝি হারাম মানে গ্রামের মোড়ল নিজে এসেছেন।

বনবাসীরা তির ধনুক নিয়েও এসেছে। দিনের পর দিন চলতে থাকা এই অত্যাচারের বিহিত চায় সকলে। স্থানীয় ছেলেরাই বেশি সক্রিয়। এটা গণপুরের লজ্জা! কয়েকজন বলল, 'এনামুলের ডেরাটা বেশি দূরে নয়, এক কিলোমিটারের ভেতরেই।'

উদ্ধারকারী দল তিনটে ভাগ হয়ে জঙ্গলে ঢুকল। ঘাঘা, কুলপাহাড়ি, ধমরপুর, বনবাতাসপুরের ছেলেরাই সবচেয়ে বেশি চেনে গণপুরের জঙ্গল। তিনটে দলেই স্থানীয় ছেলেরা ভাগ হয়ে গেল। শাল আর সেগুনের বনের মধ্যে একটু একটু করে ঢুকল সন্ধানকারী দল। বিরাজদা সোপানকে বারকয়েক বকাবকি করেছে। কিন্তু এখন তো আর কিছু করারও নেই। রাজ্য সড়কের উপর কিছু লোক অপেক্ষা করছিল বটে, কিন্তু সোপান কিছুতেই ওদের সঙ্গে জঙ্গলের বাইরে থাকতে চাইল না।

সামনে একজন জোরালো টর্চ নিয়ে এগোচ্ছে। পেছনে একটা দল লাঠি হাতে। কেউ গনগনে মশাল নিয়ে। দূরে বাকি দুটো দলকেও দেখা যাচ্ছে। মশালের আলো ক্রমশ দুটো দিকে সরে যেতে যেতে ক্ষীণ হয়ে গেল।

সোপানদের দলটাতেই বনবাসী ছেলেরা বেশি আছে। হঠাৎ বনের পথে, শুকনো পাতার মধ্যে দিয়ে কী যেন সরসর করে চলে গেল। থমকে দাঁড়ালো ওদের দলটা। সাপ! কিন্তু দেখা গেল সরসর করে এগিয়ে জীবটা একবার পেছনে ফিরে তাকালো। জ্বলজ্বল করছে চোখ, সজারু।

একটি বনবাসী সাঁওতাল ছেলে তির বাগিয়ে এগিয়ে এলো সজারুটাকে তাক করে। মাঝি হারাম অর্জুন বাসকে ছেলেটিকে বারণ করলেন। ওরা সজারুকে ছেড়ে এগিয়ে চলল।

কিন্তু বনের মধ্যে যেখানে এনামুল হকের ডেরা ভাবা হয়েছিল, সেখানে কিছু পাওয়া গেল না। ওই পোড়ো বাড়িটা ছেড়ে এনামুলের দল অন্যত্র পালিয়ে গেছে। তবে ডাকাতরা খবর পেয়ে গেছে। বনমালীকেও এখানে প্রথমে এনেছিল খুব সম্ভব। চটা ওঠা মেঝেতে রক্তের দাগ আছে। খবরের কাগজে মুড়ি পেঁয়াজ খেয়েছে ডাকাতরা।

তবে কি বনমালীদাকে মেরে ফেলে দিল?

এর পরের ঘণ্টাগুলো শুধুই হতাশা। ব্যর্থ চেষ্টা। পোড়ো বাড়িটার থেকে বের হয়ে আবার সবাই ভাগ হয়ে গেল। যোগাযোগ ফোনেই হচ্ছিল।

সোপান আজ অনুভব করল যে, রাতের অন্ধকার আকাশেরও একটা আলো আছে। যখন মশালগুলো নিভে গেল এক এক করে, তখন প্রথমে মনে হলো নিরেট নিকষ কালো অন্ধকার। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকার সয়ে এলো। বোঝা গেল, রাতের তারা আলোতেও অনেকটা দেখা যায়। এরমধ্যে একবার সোপান খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মাথার উপরে একটা 'হুম হুম' শব্দ শুনে হাতের টর্চটা একবার জ্বেলে ধরল। দেখে শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। একটা ছোট মুখ ওর দিকে তাকিয়ে। আঁতকে ওঠে সোপান, 'বাবা গো!'

বিরাজ ওর হাত ধরেই ছিল। হাতটা আর একটু জোরে চেপে ধরে বলল, 'আরে প্যাঁচা। লক্ষ্মীপ্যাঁচা। বড় উপকারী প্রাণী।' বিরাজ আবার টর্চ জ্বালালো। আলোতে দুবার উপর নীচে মাথা নাড়ল প্যাঁচা বাবাজী। ভাবটা যেন, 'ঠিক। ঠিকই বলেছ।'

রাত দুটো। ওদের দলটা হতাশ হয়ে রনে ভঙ্গ দিয়ে দিয়েছে। একটা টিলার উপর বসে দু-একজন ঝিমোচ্ছে। হঠাৎ খবর এলো পূর্বের জঙ্গলের দিকে আলো আর ধোঁয়া দেখা গেছে। শোনামাত্রই আবার সবাই চাঙ্গা হয়ে উঠে বসল। আবার এগোনো।

এবার কিন্তু সত্যিই আলো দেখা গেল। যে দলটা প্রথম দেখেছে তাতে ঋভুদা আছে। আই টি তে খুব ফান্ডা। ঋভু ঝটপট জায়গাটার জিপিএস সেট করে বাকি দুটো দলকে পাঠিয়ে দিল। খুব অল্প সময়েই তিনটে দল অকুস্থলে পৌঁছে গেল।

মাঝে একখানা বড় হ্যাজাক। সেই আলোর পাশেই মুখথুবড়ে পড়ে আছে একজন। সম্ভবত উনিই বনমালীদা। ডাকাতরা চারজন একটু দূরে বসে মদ খাচ্ছে। একটা বড় বোতল, গ্লাস আর সঙ্গে শাল পাতায় কিছু খাবারও আছে।

যদিও ওরা যথাসম্ভব নিঃশব্দেই আসছিল। কিন্তু এত লোকের আসার শব্দ ঝরা শুকনো পাতায় ঢাকা বনপথে লুকোনো সম্ভব হল না। এনামুলের দল লাফিয়ে উঠল। ওদের মধ্যে একজনের ঘন দাড়ি কিন্তু গোফ নেই। লম্বা চওড়া সবচেয়ে হাট্টাকাট্টা চেহারা। পরে জেনেছে ও হলো আবদুল বারি। এনামুলের দলের ওই সবচেয়ে নৃশংস।

আবদুলের হাতে একটা রিভলভার। ও লাফিয়ে উঠেই

একেবারে বনমালীদার কাছে পৌঁছল। চুলের মুঠি ধরে তুলল নেতিয়ে পড়া শরীরটাকে। বনমালীর কপালে বন্দুক রেখে হুমকি দেয় আবদুল, 'কেউ এক পা এগোলেই এই মুরগাটা কোতল হবে।'

সবাই থমকে যায়। শুধু দণ্ড হাতে দু-তিন জন স্বয়ংসেবক একটু আধটু নড়াচড়া করছিল। তারমধ্যে ছিল তারাপুর শাখার মুখ্য শিক্ষক প্রীতম। প্রীতম এবছরই তৃতীয়বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ করে এসেছে। লাঠি ওর দুহাতে যেন কথা বলে। প্রীতমের চোখের ইঙ্গিতেই দুটি ছেলে লাঠি নিয়ে অন্য দুদিকে পজিশন নিয়ে নিচ্ছিল। আবদুল সেটা লক্ষ্য করে চিৎকার করে উঠল, 'খবরদার, বেশি চালাকির চেষ্টা করো না। আমাদের যেতে দাও, সেফ প্যাসেজ না দিলে এ মরবে।'

কথা শেষ হতে না হতেই পেছনদিকের একজন দাদা একপদ পুরসের মতো করে পদবিন্যাস করাতে পাতার মচমচ শব্দ হলো সামান্য। আবদুলের সেদিকে মনোযোগ যেতেই প্রীতমদা বিদ্যুৎগতিতে ভ্রমণ স্থানান্তর করে আবদুলের একেবারে ঘাড়ে পড়ল। মাথার উপরে হেলিকপ্টারের মতো লাঠি ঘুরতে ঘুরতে আছড়ে পড়ল। চোখের পলক পড়ার আগেই খেল খতম। আবদুলের হাত থেকে ছিটকে গেল রিভলভার। প্রীতমদার লাঠি সপাটে নেমে এল দুষ্কৃতীর হাটুতে। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল আবদুল।

এনামুল বেগতিক দেখে উপরে ফায়ার করল। বন্দুকের গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার, 'কেউ এক পা এগোলেই গুলি চালাব। যে কটা মরবে মরবে।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই আবার গুলির শব্দ।

'হ্যান্ডস আপ, অনামুল। তোমার খেলা শেষ।' ইউনিফর্মে রিভলভার উঁচিয়ে এগিয়ে এলেন এক অফিসার। সঙ্গে আরও চার পাঁচ জন পুলিশ অফিসার ও সেপাই। কারও হাতে রিভলভার, কেউ বা রাইফেল তাক করে

আছে। সবার লক্ষ্যই এনামুল আর তার দুই সাগরেদের দিকে।

খবর পেয়ে এস পি সাহেব বড় পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসেছেন। এই সবই ব্যবস্থা হয়েছে ছোটমামার ফোনাফোনিতে। অপরাধী চারজনকে গ্রেপ্তার করেই বেঁধে ফেলল পুলিশ। ক'দিন আগেই শেখানো কায়দায়, দুজন স্বয়ংসেবক নিজেদের দুটো জামা খুলে দুদিকে দণ্ড ঢুকিয়ে তৈরি করে নিল চটজলদি স্ট্রেচার। বনমালীদাকে কোনওমতে শোয়ানো হলো তাতে। বনমালীদার অল্প জ্ঞান আছে। তারমধ্যেই অস্ফুটে কী বলতে চাইছে।

তরুণমামা কাছে গিয়ে শুনতে চাইল, বনমালীদা কোনওমতে বলল, 'শোভনা কেমন আছে?'

তরুণমামা মাথায় হাত রেখে বললে, 'ভালো আছেন। আর বিপদ নেই।'

এতক্ষণ পরে সোপান একটু সাহস সঞ্চয় করে এলো ছোটমামার কাছে। জড়িয়ে ধরে বলল, 'মামা! মাই হিরো।'

ছোটমামা কী বলার আগেই এস পি সাহেব এসে হাত বাড়ালেন, 'আমরা চললাম ডক্টর গাঙ্গুলী। আপনাকে কি ড্রপ করব?'

ছোটমামা করমর্দন করে বলল, 'না, ধন্যবাদ। আমি সকলের সঙ্গেই যাবো। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ তো আপনাদের দেওয়া উচিত। আমি আজকের সম্পূর্ণ ঘটনা ডিপার্টমেন্টকে জানাব। সত্যিই নাগরিক সমাজের এই ভূমিকা প্রশংসনীয়। অতুলনীয়। আপনি তরুণবাবুকে সঙ্গে নিয়ে একবার আসুন, একটু আলোচনা আছে।'

তরুণমামাও হাত মেলালো এস পি সাহেবের সঙ্গে। উনি চলে গেলে মামার দিকে ফিরে বললেন, 'চলি ডাক্তার, যার শেষ ভালো তার...'

'সব ভালো। যাও নিবাসে গিয়ে স্নান করে টানা ঘুম দাও। গত ক'দিন তো প্রায় ঘুমোওনি।' ছোটমামা যোগ করে।

তরুণমামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সে হবার নয়। এখুনি স্নান করে সিউড়ি যেতে হবে। ওদের মাসিক বর্গ বৈঠক আছে। একটা সত্র আমাকে নিতে হবে।

তরুণমামা বাইকে চেপে স্টার্ট দিল। জঙ্গলের উঁচু নীচু টিলা খানাখন্দের মধ্যে দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। ছোটমামা সেদিকে তাকিয়ে আপনমনে বলল, 'এরা সাধারণ পোশাকের সন্ন্যাসী। অসাধারণ।'

সোপান ঠিক ঠাওরে উঠতে পারে না। বলে, 'কী বলছ মামা?'

ছোটমামার যেন ঘোর ভাঙ্গল। 'নাঃ! কিছু নয়। তুমি বাড়ি চলো। তোমার বাবা আসছেন, তোমায় নিতে। দিদি আমাকে প্রতি ঘণ্টায় ফোন করেছে। তোমার কপালে দুঃখ আছে। আমার কপালেই বা কী আছে কে জানে?' ▮

ANOOPAM

METAL INDUSTRIES

ISO 9001-2000 Certified

Manufacters & Exporters

AIMEX BRAND ALLEN BOLTS, GRUB SCREWS, ALLEN SCREWS &CYCLE PARTS

B-6, Textile Colony, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, Fax : 91-161-5013390
e-mail : annopam_met@hotmail.com

ছোঁয়াছুঁয়ি

সিদ্ধার্থ সিংহ

না। একে তাকে ধরে, গেম টিচারের কাছে হাজার অনুনয়-বিনয় করেও স্কুলে ক্রিকেট টিমে জায়গা হলো না তিমিরের। হবেই বা কী করে? ক্রিকেট হচ্ছে রাজসিক খেলা। ও খেলা রাজাদেরই মানায় তার মতো চাষ করতে গিয়ে ঋণে জর্জরিত অতি সামান্য ভাগচাষির ছেলেকে কি ওই খেলা মানায়! যতই সে ভাল খেলুক। ছুটে আসা এক একটা আগুনের গোলাকে মেরে যতই তালগাছের উপর দিয়ে গ্রামের সীমানার ওপারে পাঠাক, চিলের চেয়ে ক্ষিপ্ত গতিতে উড়ে গিয়ে বাতাসের কবল থেকে ছোঁ মেরে

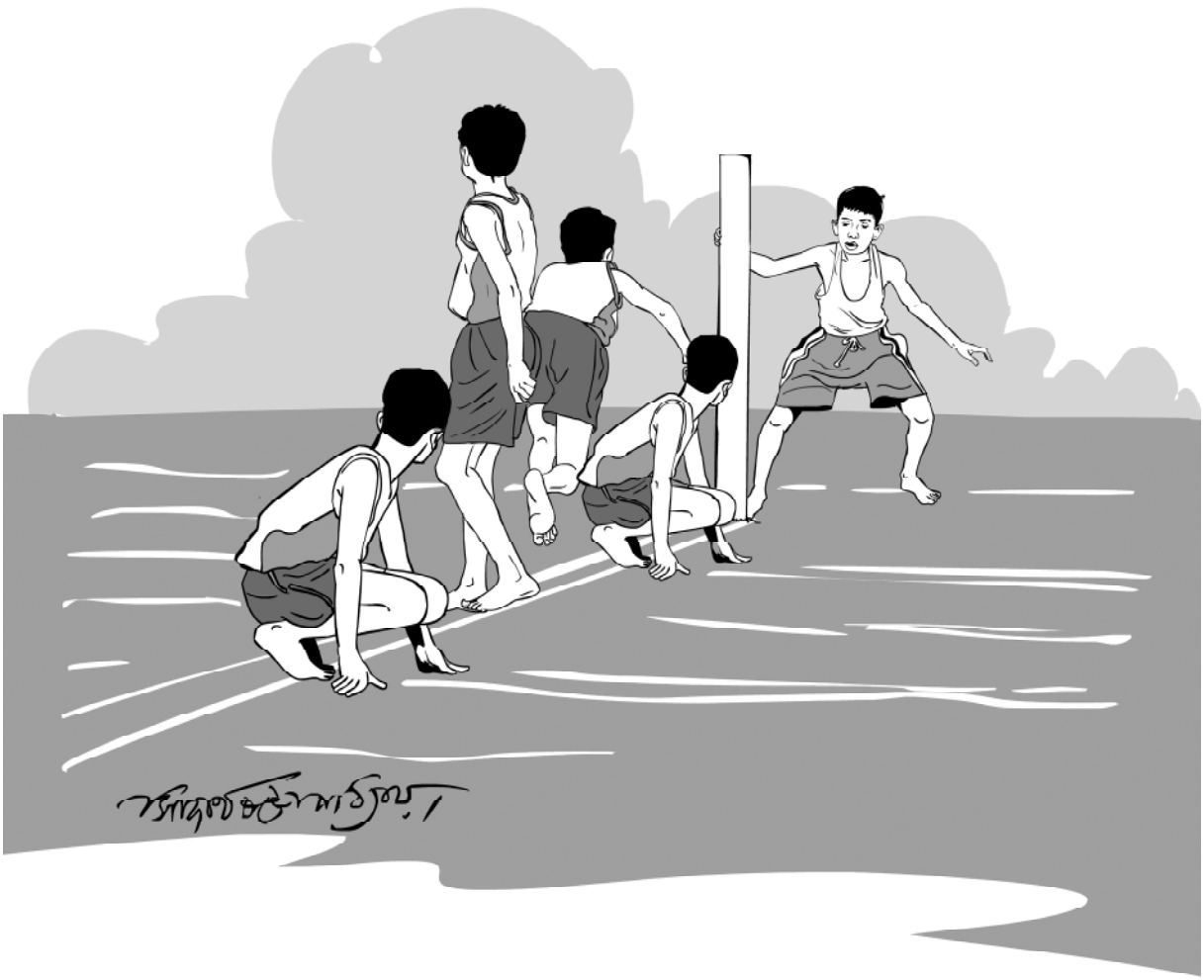

লুফে নিক এক একটা বল, ব্যাটে কোনওরকমে বল ছুঁইয়েই চিতাবাঘের মতো দৌড়ে এক রানের জায়গায় নিয়ে নিক তিন রান, তবু কোনও স্কুল টিমে চান্স পাওয়ার জন্য শুধু এগুলোই যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে গ্রামের দিকে। আর সে তো থাকে হুগলি জেলার আরামবাগের অনেক ভিতরে। সালেপুরের রুইদাস পাড়ার মতো একটা এঁদো গ্রামে। টেনেটুনে কোনও রকমে ক্লাস সিক্সে উঠেছে। তার উপর তার না আছে কোনও চালচুলো, না আছে কোনও চেনাজানা। ফলে শুধু খেলায় কেন, কোনও ব্যাপারেই কেবল সুযোগ নয়, যোগ্যতা অনুযায়ী ন্যায্যটুকু পাওয়ারও কথা নয় তার। কারণ ওসবের পিছনে একটা অন্য খেলা চলে। চলে অন্য হিসাব। পঞ্চায়েত প্রধানের রেকমেন্ডেশন লাগে। লাগে স্কুল পরিচালন কমিটির সঙ্গে বাবা-কাকাদের দহরম মহরম সম্পর্ক। থাকতে হয় মাথার উপর বড় কোনও মানুষের হাত।

তা হলে কী হবে! তিমির জিজ্ঞেস করতেই, গেম টিচার বললেন, তুই একটা কাজ কর। তুই বরং খো-খো'য় নাম লেখা। ওখানে এখনও বেশ কয়েকটা খালি আছে। দেরি করলে কিন্তু ওটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত খো-খো! হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে সে খো-খো খেলেছে ঠিকই, কিন্তু তা বলে.... ক্রিকেট থেকে একেবারে খো-খো!

ওর বাবা বলেন, যে কাজই করবি, সেটা যদি জুতো সেলাইও হয়, সেটাও মন দিয়ে করবি। দেখবি, একদিন না একদিন ঠিক তার কদর পাবি।

ওকে নাক সিঁটকাতে দেখে গেম টিচার বললেন, শোন, যদি খেলতে পারিস... কোনও খেলাই ছোট নয়। এক সময় তো ফুটবলই একচ্ছত্র রাজত্ব করত এই দেশে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা হলে আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, শুধু কমেন্ট্রি শোনার জন্যই বিক্রি হয়ে যেত লক্ষ লক্ষ পকেট ট্রানজিস্টর। সেই খেলা খেলতে জোশ লাগত। দম লাগত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হতো। সেই পরিশ্রম করার ক্ষমতা সবার থাকত না। তাই ফুটবল ছেড়ে অনেকেই অন্য খেলায় চলে যেত।

কে বলতে পারে, সুনীল গাভাসকর, সচিন তেণ্ডুলকর, এমনকী আমাদের সৌরভ গাঙ্গুলিও যে চৌখস ফুটবলারদের মতো অমন অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারবেন না বলেই ক্রিকেট খেলায় আসেননি! যেদিন তাঁদের ক্রিকেট খেলায় নাম লেখাতে হয়েছিল, তখনও তো ওটা সেভাবে জাতে ওঠেনি। হয়তো তাঁরাও সেদিন তোর মতোই এই রকমই হতাশ হয়েছিলেন।

অথচ দেখ, তাঁরা তাঁদের ক্রিকেটে সব কিছু নিংড়ে উজাড় করে দিয়েছিলেন দেখেই আজকে শুধু তাঁরা নিজেরাই সফল হয়নি, সেই খেলাটাকে তুলে এনেছেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। কে বলতে পারে, একদিন হয়তো তোর হাত ধরেই এই খো-খো খেলা এত বিপুল সাড়া ফেলবে যে ক্রিকেটকেও ম্লান করে দেবে। কী করবি বল?

গত বছর ওদের সালেপুর হাইস্কুলের ওর ক্লাসেরই এক বন্ধু খো-খো টিমে নাম লিখিয়েছিল। এত খেলা থাকতে ও কেন খো-খোয় নাম লেখাল, সেটা জিজ্ঞেস করতেই ও বলেছিল, দ্যাখ, ক্রিকেট খেলতে গেলে যা খরচা হয়, তা চালানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তুই তো জানিস, বাবা পরের পুকুরে মাছ ধরে। তাতে আর ক'টা টাকাই বা পায় বল! অথচ ক্রিকেট খেলতে গেলে এই লাগে সেই লাগে। একটা কিটসেরই কত দাম! ওগুলো হচ্ছে বড়লোকদের খেলা। অথচ খো-খো খেলতে গেলে কোনও ইন্সট্রুমেন্ট তো নয়ই, প্রায় কিছুই লাগে না। দুদিকের দুটো খুঁটি আর খোপ কাটার জন্য একটু চুন লাগে। চুন না পেলে ছাই দিয়েও কাজ চালানো যায়। সেটাও জোগাড় না হলে কোদাল দিয়ে কেটেও লাইন বানিয়ে নেওয়া যায়। এছাড়া যেগুলো লাগে, তা আমাদের প্রায় সবারই আছে। আর সেগুলি হল— অফুরন্ত দম, গতি, কৌশল, শক্তি, ক্ষমতা, তৎপরতা, ক্ষিপ্রতা আর ভারসাম্য বজায় রাখা। ব্যাস। এগুলি হলেই হলো। আর যাদের এগুলি নেই, তাদের এগুলি রপ্ত করা আমাদের মতো প্রত্যেক দিন রোদে পুড়ে জলে ভিজে মাঠেঘাটে কাজ করা ছেলেদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

ওর আর এক বন্ধু হরিশ। ওর থেকে দু'ক্লাস উপরে পড়ে। সে বলেছিল, ভারতবর্ষ জুড়ে এই মুহূর্তে কত লক্ষ লক্ষ ছেলে ক্রিকেট খেলছে জানিস! পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে কত ক্রিকেট কোচিং সেন্টার গজিয়ে উঠেছে জানিস? সেখানে কোন ফ্যামিলির ছেলেরা খেলে জানিস? আমরা সেখানে পাত্তাই পাব না। প্রতিদিন সেখানে ভিড় বাড়ছে। এই মুহূর্তে যদি কুড়ি লক্ষ ছেলেও খেলে, তার মধ্যে থেকে চান্স পাবে ক'জন বল? খুব বেশি হলে কুড়ি জন। তার মানে দলে জায়গা পেতে গেলে আমাকে কত জনের সঙ্গে লড়তে হবে, বল? প্রায় উনিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার ন'শো আশিজন ছেলের সঙ্গে। তাই না? সেই তুলনায় খো-খোর জায়গা তো অনেক ছোট। ভিড় অনেক কম। আর তা ছাড়া এটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় খেলা। আমরা আমাদের দেশের খেলা ছেড়ে কেন বিদেশের খেলা খেলতে যাব বল তো?

মনের মধ্যে খুঁতখুঁত করলেও ওই কথাগুলো মনে পড়তেই তিমির আর মুখে কিছু বলল না। শুধু মাথা কাত করল। সেটা দেখে গেম টিচার বললেন, তাহলে কাল সকালে মাঠে চলে আসিস। ক'দিন প্র্যাকটিস করাব। কারণ, সামনের সপ্তাহেই কলকাতা থেকে বলরাম হালদারের আসার কথা। তিনি শুধু খো-খোর প্রশিক্ষকই নন, রাজ্য খো-খো সংস্থার যুগ্ম সম্পাদকও।

এমনিতেই খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে ও। ক'দিন ধরে আরও ভোরে উঠছে। উঠেই কাঁচালঙ্কা আর নুন দিয়ে পান্তাভাত খেয়েই স্কুলের সামনের মাঠে চলে যাচ্ছে। গেম টিচারের দেখিয়ে দেওয়া কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ অন্তত আধঘণ্টা ধরে করছে। এ মাথা থেকে ও মাথা দৌড়াচ্ছে। তার পর মাঠে নেমে এতদিন যেভাবে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে যখন যে ক'জন এসেছে, সেভাবে দল ভাগ করে কখনও সখনও এক আধজন বেশি হয়ে গেলে, যে দল দুর্বল, সেই দলে তাকে দিয়ে দিয়েছে। তাতে কোনও দলে গুনতিতে বেশি ছেলে হলেও কেউ কোনও আপত্তি করেনি। বরং খুশিই হয়েছে।

কিন্তু এখন আর সেভাবে খেলছে না। খো-খো কোর্ট তৈরি হয়েছে একেবারে নিয়ম মেনে। চোদ্দ মিটার প্রস্থ। তেইশ মিটার দৈর্ঘ্য। সেই দৈর্ঘ্যের দুই প্রান্তে প্রস্থের ঠিক মাঝখানে দুটি খুঁটি পোঁতা। দুই খুঁটির মাঝ বরাবর একটা রেখা এমনভাবে টানা হয়েছে, যাতে প্রস্থের এদিকে সাত মিটার আর ওদিকে সাত মিটার থাকে। সেই রেখাটাকে আটটা সমান ভাগে ভাগ করে আরও আটটা রেখা টানা হয়েছে প্রস্থের দুই সীমানা পর্যন্ত।

গেম টিচার বললেন, তোরা আগে যেভাবে খো-খো খেলেছিস, সেটা ভুলে যা। মনে রাখবি এটা একটা দলগত খেলা। খেলা হয় দুটো দলে। এক দল চেজ করে অন্য দল ডিফেন্স। প্রতি দলে বারো জন করে খেলোয়াড় থাকলেও মাঠে নামে কিন্তু ন'জন করে। বাকি তিন জন রিজার্ভে থাকে। যদি কোনও ভুলচুকের জন্য খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়, তা হলে তার পরিবর্তে যাতে ওখান থেকে খেলোয়াড় নামাতে পারে।

যারা চেজ করে, সেই দলের ন'জনের আট জন দুই খুঁটির মাঝ বরাবর রেখার মধ্যে সব দূরত্বের যে আটটি রেখা ভেদ করে, সেই আটটি সংযোগ স্থল গিয়ে বসে। পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে। আর নবম জন দু'প্রান্তের যে কোনও একটি খুঁটির কাছ থেকে চেজিং শুরু করে। চেজ মানে দৌড়ে গিয়ে ডিফেন্ডারকে ছোঁয়া। ছুঁলেই আউট। এই চেজারের মুখ যে দিকে থাকে তাকে সে দিকেই ছুটতে হয়। সে পিছন ফিরতে পারে না। পিছন থেকে যেতে গেলে সামনের খুঁটির ওপাশ থেকে ঘুরে আসতে হয়। এমনকী যে আট জন চেজার দুই খুঁটির মাঝ বরাবর খানিক দূর দূর বিপরীতমুখী হয়ে বসে থাকে, তাদের মাঝখান দিয়েও গলে যেতে পারে না।

আর যারা ডিফেন্স করে তাদেরও ন'জন খেলোয়াড় কিন্তু একসঙ্গে মাঠে নামে না। সেই ন'জনকে দক্ষতা আর যোগ্যতা অনুযায়ী তিনজন করে তিনটে উপদলে ভাগ করা হয়। প্রথমে একটি উপদল নামে। সেই উপদলের তিনজনই ম'র হয়ে গেলে, মানে আউট হয়ে গেলে মাঠে বাইরে অপেক্ষা করা পরের উপদলটি নামে। এবং চেজারদের যতই বিধিনিষেধ থাকুক না কেন, ডিফেন্ডাররা কিন্তু যে দিকে খুশি যেতে পারে। আগে-পিছেই শুধু নয়, দুই খুঁটির মাঝখানে যে আটজন চেজার বসে থাকে, তাদের যে কোনও ফাঁক থেকে যতবার খুশি গলে যেতে পারে। অর্থাৎ তাদের কাছে পুরো কোর্টটাই ফ্রি জোন। তবে হ্যাঁ, চক দিয়ে কোর্টের যে সীমানা কাটা থাকে, তার বাইরে যেতে পারে না। অন্তত একটা পা কোর্টের মধ্যে রাখতেই হয়।

খেলার আগে প্রতিদিনই টস হয়েছে। যারা টস জিতেছে তারা কখনও নিয়েছে চেজিং। কখনও ডিফেন্স।

না। ন'মিনিট করে নয়। ওটা বড়দের জন্য। তাদের বয়স যেহেতু আন্ডার টুয়েলভ, তাই সাত মিনিট করে এক একটি পর্ব। প্রতি পর্বের পর তিন মিনিট করে বিরতি। মোট চারটি পর্ব। দুটি পর্ব মিলিয়ে একটি পর্যায়। তবে পর্যায়ের শেষে আর তিন মিনিট নয়, তখন ছ'মিনিটের বিরতি। অর্থাৎ সাত প্লাস তিন প্লাস সাত প্লাস ছয় প্লাস সাত প্লাস তিন প্লাস সাত মিলিয়ে মোট চল্লিশ মিনিট করে খেলেছে ওরা।

প্রতিটি পর্বের পর পালাবদল হয়েছে। আগের পর্বে যারা চেজিং করেছে, তারা পরের পর্বে ডিফেন্স করতে নেমেছে। আর ডিফেন্সরা নেমেছে চেজিং করতে। চেজিং করার সময় বিপক্ষ দলের যত জনকে ছুঁয়ে ম'র করছে, তত পয়েন্ট পেয়েছে তারা। দুই পর্যায়ের সংগ্রহ করা পয়েন্টের ব্যবধানেই নির্ধারিত হয়েছে জয়-পরাজয়।

বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে চেজার আক্রমণ শুরু করেছে। যখন কোনও চেজার কোনও ডিফেন্ডারকে নাগালে পায়নি, তখন দুটি খুঁটির মাঝ বরাবর বসে থাকা চেজারের পিঠে হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে 'খো' বলেছে। 'খো' পাওয়ার পর সেই চেজার সঙ্গে সঙ্গে একজন সক্রিয় চেজার হয়ে উঠেছে। আর তার জায়গায় যে তাকে 'খো' দিয়েছে, সে বসে পড়েছে।

কেউ ছোঁয়ার আগেই 'খো' বললে, আবার খো বলে স্পর্শ না করলেই বিধিভঙ্গ হয়েছে। সে ক্ষেত্রে গেম টিচার তাকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। আর তার চেয়েও গুরুতর বা একই বিধি বারবার ভাঙলে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বার করে দিয়েছেন। শুধু তাই-ই নয়, তাকে আর সেদিন ওই খেলায় অংশই নিতে দেননি। তার পরিবর্তে রিজার্ভে থাকা তিনজন খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে যে কোনও একজনকে নামানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

তাদের গেম টিচার সারা মাঠ দৌড়ে দৌড়ে একাই দুজন আম্পায়ার, একজন রেফারি, একজন টাইম কিপার এবং একজন স্কোরার অর্থাৎ একাই পাঁচ জনের কাজ করে গেছেন।

এই ক'দিন প্র্যাকটিস করেই নতুন নতুন অনেক নিয়মকানুন আর এই খেলার বেশ কিছু খুঁটিনাটি খুব ভালো করে জেনে নিয়েছে তিমির। তাই ভেবেছিল, গতকাল রাতে কলকাতা থেকে আসা বলরামবাবু যখন এগারোটার সময় সবাইকে নিয়ে বসবেন, তখন ও আর সেখানে যাবে না। বরং বাবার হাতে হাতে চাষের কাজ করার জন্য মাঠে চলে যাবে। কিন্তু গেম টিচার যখন বললেন, তোদের সবাইকেই আসতে হবে। কারণ, পারফরমেন্স দেখে কালই উনি স্কুল টিম তৈরি করে দেবেন। যে আসবে না বা যে শেষ পর্যন্ত থাকবে না, সে যত ভালই খেলুক না কেন, তাকে তিনি স্কুল টিমে রাখবেন না।

তখন ও সিদ্ধান্ত বদল করল।

ওরা একটু আগেই পৌঁছে গিয়েছিল স্কুলে। স্কুল মানে তিনটে মাটির ঘর। তার একটার দেওয়াল আবার হেলে পড়েছে। যে কোনওদিন ভেঙে পড়তে পারে। এছাড়া দুটো টিনের আর দুটো পাকা ঘর। তারই একটায় থাকার ব্যবস্থা হয়েছে বলরামবাবুর। শোওয়ার জন্য নীচে পুরু করে পেতে দেওয়া হয়েছে বিচালি। তার উপরে চাদর। তাতেই উনি ঘুমিয়েছিলেন। তাঁর নাকি এসব অভ্যাস আছে। তাই শুধু গেম টিচারই নয়, স্কুল পরিচালন কমিটির একজন সদস্যও তাঁদের বাড়িতে তাঁকে রাতে থাকার কথা বললেও তিনি তা সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমনকী এখানে সাপের উপদ্রপের কথা শুনেও উনি হো হো করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। উনি নাকি বলেছেন, সাপের সঙ্গে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা আমার আছে।

সে যাই হোক, আজ সন্ধের মধ্যেই স্কুল টিম তৈরি করে দিয়ে কাল সকালেই ফিরে যাবেন। তাই অন্য যে পাকা ঘর আছে, এখনও প্লাস্টার হয়নি সেটা। ইটের ফাঁকফোকর থেকে শুকিয়ে যাওয়া সিমেন্ট-বালির চাঙড় উঁকি মারছে। সেই ঘরেই এসে জড়ো হয়েছে ওরা।

গেম টিচার ওদের আগেই বলে দিয়েছিলেন, কারও যদি কোনও কিছু জানার থাকে, মন খুলে তাঁর কাছ থেকে জেনে নিস। উনি খুব ভালো মানুষ।

খানিক বাদেই গেম টিচারের সঙ্গে যে বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারার লোকটা ঘরে ঢুকলেন, তাঁকে দেখেই ওরা বুঝতে পারল, ইনিই সেই লোক। উনি ঘরে ঢুকে কোনও ভনিতা না করেই বললেন, তোমাদের একটা কথা বলি। তোমরা খো-খো খেলতে এসেছ। খুব ভালো কথা। কিন্তু যেটা খেলতে এসেছ, সেই খেলার ইতিহাস কি তোমরা জানো? জানলে হাত তোলো।

না। একজনও হাত তুলল না।

সারা ঘরে উনি একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, যদিও কবাডি, মালখাম্বা, দাড়িয়াবান্দা, আটিয়া পাটিয়া, শিড়গিজ-এর মতো এই খো-খোটাও আমাদের দেশের আদি খেলা। কিন্তু এই খেলা উনিশশো চোদ্দ সালে সরকারি ভাবে প্রথম শুরু হয় মহারাষ্ট্রের ডেকান জিমখানা ক্লাবে। উনিশশো চব্বিশ সালে গুজরাতেরই বিজয়হিন্দ জিমখানা ক্লাবে এই খেলার প্রাথমিক নিয়মকানুন তৈরি হয়। এবং ওই রাজ্যেরই ড. বাইনরুলকার ও কে.জি. অ্যালায়েন এগিয়ে আসেন এর প্রচার ও প্রসারে। উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে ভারতীয় এবং উনিশশো সাতাশি সালে এশিয়ান খো-খো ফেডারেশন গঠিত হাওয়ার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এটা ছড়িয়ে পড়ে।

এখন তো ভুটান, জাপান, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এমনকী মায়ানমারেও এই খেলা হচ্ছে। এই খেলায় সবচেয়ে সুবিধা হলো, এতে খেলোয়াড় খাটো হলে ডিফেন্সের সময় যেমন ভড়কি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুবিধা পায়, তেমনি লম্বা হলেও চেজিংয়ের সময় বড় বড় পা ফেলে ছুটে গিয়ে লম্বা লম্বা হাত দিয়ে অনেক দূর থেকেই বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে ম'র করে দিতে পারে। তাই আমরা দু'ধরনের খেলোয়াড়কেই দু'রকম ভাবে তালিম দিই।

তবে একটা কথা, এটা যেহেতু গ্রাম, ইনডোর ম্যাট্রেসের উপরে ম্যাটের জুতো পরে খেলা হচ্ছে না, এমনকী কেম্বিসের জুতো পরেও না। তোমরা খালি পায়ে খেলছ, তাই খো-খো খেলার জন্য যেখানে কোর্ট কাটা হবে, সেই মাঠটা আগে ভালো করে দেখে নিও। যাতে সেখানে কোনও ইটের টুকরো বা ভাঁড় ভাঙা মাথা তুলে না থাকে। কাঁচের টুকরো পড়ে না থাকে। পুজো, বিয়ে বা অন্নপ্রাশনের প্যান্ডেল যে মাঠে হয়, সে মাঠে হলে ভাল করে দেখে নিতে হবে, যাতে পেরেক পড়ে না থাকে এবং গর্তও

যেন না থাকে। এতে ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গর্তে পা পড়ে অ্যাঙ্কেল সরে যেতে পারে। বেকায়দায় পড়ে মালাইচাকি ঘুরে যেতে পারে। উঠে থাকা ইটের কোণায় লেগে পায়ের নখ উঠে যেতে পারে। তাই মাঠ পরিষ্কার থাকলেও খেলার সময় হাতের কাছে সব সময় একটা ফার্স্ট এইড বক্স রাখা অত্যন্ত জরুরি। অন্তত একটু ডেটল আর তুলো। নিদেনপক্ষে কয়েকটা ব্যান্ড এড।

এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও জেনে রাখো, আমরা কিন্তু এতদিন সেরকম ভাবে কোনও সুযোগ সুবিধা পাইনি। না রাজ্য সরকারের কাছ থেকে, না কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। স্পনসরও জোটেনি। জুটবেই বা কী করে? মিডিয়ারা তো অন্য খেলা নিয়ে ব্যস্ত। খো-খোর দিকে তাকাবার ফুরসতই নেই তাদের। অঅর আমাদের দেশ? আমেরিকা যেমন বাসকেট বলকে, জাপান যেমন জুড়োকে, সুইজারল্যান্ড যেমন চকলকে, চিন যেমন মার্শার আর্টকে প্রমোট করে, আমাদের দেশ কিন্তু তাদের এই দেশীয় খেলাকে এতদিন প্রমোট তো নয়ই, এমনকী এই খেলাটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটা পয়সাও খরচা করেনি। একেবারে অস্পৃশ্য করে রেখে দিয়েছিল। এখন অবশ্য অতটা খারাপ অবস্থা নয়। তবু...

এই তো কিছুদিন আগে পঁয়তিরিশতম জাতীয় গেমসে ফুটবল দলকে যেখানে বিমানে করে কেরলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে আমাদের যেতে হয়েছে স্লিপার কোচে। অথচ এই গেমসে ওরা নয়, দলীয় খেলায় একমাত্র পদক ছিনিয়ে এনেছে এই খো-খো। না। শুধু পুরুষরাই নয়, মহিলারাও।

আর এই জন্য এখন এই সরকারের ক্রীড়া বিভাগ, ক্রীড়া পর্ষদ এবং সাইয়ের মাধ্যমে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরেও আমরা

কেবল প্রশিক্ষণই পাচ্ছি না, নানারকম সাহায্য ও সহযোগিতাও পাচ্ছি।

এর মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলার খেতাব 'অর্জুন পুরস্কার' ছিনিয়ে নিয়েছে খো-খো-র মোট বারো জন খেলোয়াড়। দ্রোণাচার্য প্রশিক্ষকের খেতাবও হাতে চলে এসেছে একজনের।

আর এর জন্যই টনক নড়েছে বহু সংস্থারও। তাই ফুটবলার, ক্রিকেটারদের মতো এত দিন বাদে খো-খো খেলোয়াড়দেরও চাকরি হচ্ছে পুলিশে, ইনকাম ট্যাক্সে, ব্যাঙ্কে, এমনকী রেলেও। আমি কথা দিচ্ছি, তোমরাও শুধু মনপ্রাণ দিয়ে খেলে যাও। তোমাদের দায়িত্ব আমার।

ক্লাশরুম থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বলরামবাবু বলেছিলেন, তবে তোমরা কারা কারা শেষ পর্যন্ত এই স্কুল টিমে থাকবে, তা তোমাদের দৌড়, টার্নিং, ব্যালান্স এবং খেলার কৌশল দেখার

পরেই আমি ঠিক করব। তোমরা তিনটে নাগাদ চলে এসো। ঠিক আছে?

প্রত্যেকেই ঘাড় কাত করেছিল।

যাবার আগে গেম টিচারের হাতে উনি তুলে দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ খো-খো অ্যাসোসিয়েশন থেকে দু'হাজার দশ সালে প্রকাশিত তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শ্রী দীপঙ্কর বাগচীর লেখা 'খো-খো খেলার নিয়মাবলী'। তার সঙ্গে দিয়েছিলেন জেরক্স করা একটা পাতাও। যাতে লেখা ছিল, ওই বই প্রকাশের পরেই দু'হাজার তেরো সালে যে নিয়মকানুনগুলি অদল-বদল হয়েছিল তার সংশোধনী।

স্কুল টিমে কে কে চান্স পাবে আজই তার তালিকা তৈরি হয়ে যাবে। তাই তিনটের আগেই সবাই মাঠে চলে এসেছে। এসেছেন বলরামবাবুও। তখন খুঁটি পোঁতা হয়ে গেছে। চকের গুঁড়ো দিয়ে খোপ কাটা হচ্ছে। যে খোপ কাটছে, তার হাতে কাগজের ঠোঙায় চকের পরিমাণ দেখে উনি বললেন, অত খোপ কাটতে হবে না। সেন্টার লাইনেও কম হলে চলবে। চুনটা আউট লাইনে বেশি করে দাও। যাতে চেজারের কাছ থেকে পালাবার সময় কোর্টের আউট লাইনটা ডিফেন্ডারদের চোখে পড়ে।

কিন্তু খেলা শুরু হতে না হতেই উনি খেলা থামিয়ে দিলেন। তারপর চেজারের উদ্দেশে বললেন, একী! শুধু ছুটছ কেন? ডিফেন্ডারের গতি খেয়াল করো। ও কোন দিকে যাচ্ছে। কোন দিকে যেতে পারে। বুঝেছ? ডিফেন্ডার সব সময় চাইবে তুমি যেই তাড়া করবে টুক করে দুই খুঁটির মাঝ বরাবর বসা চেজারদের মাঝখান থেকে গলে ওদিকে চলে যাবার। কারণ, তুমি তো ওখান থেকে গলে গিয়ে ওকে ছুঁতে পারবে না। ওদিকে যেতে গেলে তোমাকে ওই খুঁটির ও পাশ থেকে ঘুরে তারপর যেতে হবে। তখন তুমি কী করবে? খেয়াল করবে ডিফেন্ডার যেখানে আছে, তার সবচেয়ে কাছে ওদিকে মুখ করে কোন চেজার বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে খো দেবে। তা হলে সে উঠেই তাকে ছুঁতে পারবে।

সেই চেজার বলেছিল, তাতে কী হবে? ও তো আবার সেন্টার লাইন টপকে এ পাশে চলে আসবে।

বলরামবাবু বলেছিলেন, সে তো আসবেই। ও তো চাইবেই নিজেরে রক্ষা করতে।

— তা হলে?

— যেই ও এদিকে আসবে সঙ্গে সঙ্গে ওই চেজার এ দিকে মুখ করে বসা চেজারকে খো দেবে। এবং এটা যে যত দ্রুত করতে পারবে, জানবে সেই তত চৌখস হয়ে উঠছে।

— তা হলে খুঁটির ও পার থেকে ঘুরে গিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করব না?

— কেন করবে না? সেটা বুঝে করতে হবে। এটাই তো খেলা। আর তোমাদের বলছি বলেই ডিফেন্ডারদের উদ্দেশে বলেছিলেন, চেজাদের গতিবিধির দিকে খেয়াল রাখো। ওদের কাছ থেকে নিজেদের এমন দূরত্বে রাখো যাতে সহজে আউট না হও। এবং চেজাররা যাতে তোমাদের গতিবিধি আন্দাজ করতে না পারে, সেদিকে নজর দাও। দরকার হলে টুক করে সেন্টার লাইন ক্রস করে ওপারে চলে যাও। তবে খেয়াল রাখবে, সেন্টার লাইন থেকে কখনোই এত দূরে সরে যাবে না, যাতে তাড়া খেয়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ভুল করে কোর্টের বাইরে চলে যাও।

আর আপনাকে বলছি, বলে, গেম টিচারকে বলেছিলেন, খুঁটি দুটোতে এত গাঁট কেন? ভাল করে চেঁছে একদম মসৃণ করে নেবেন। কারণ, চেজাররা যখন দৌড়ে গিয়ে ওটা ধরে বাঁক নেয়, তখন এই গাঁটে লেগে হাতের তালু ইনজুরি হতে পারে। আর এমন ভাবে পোলটা পুঁতবেন, যাতে মাটির উপরে একশো কুড়ি সেন্টিমিটার দাঁড়িয়ে থাকে। এটাই নিয়ম। তাতে লম্বা হলেও কোনও খেলোয়াড়ের কোনও অসুবিধা হবে না।

ফের খেলা শুরু হলো। খানিকক্ষণ পরেই উনি আবার খেলা থামিয়ে দিলেন। চেজারকে বললেন, নিজের গতি কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করো। ডিফেন্ডার ঝট করে সেন্টার লাইনের ও পরে চলে গেল, আর তুমি নিজের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে অতটা চলে গেলে! অতটা গিয়ে তুমি যাকে খো দিলে, সে যখন উঠে দাঁড়াল, সেই সময়ের মধ্যে ও সেই চেজারের থেকে কতটা দূরত্ব তৈরি করে নিল বলো তো? তোমার যা গতি ছিল, তুমি তো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতে। বুদ্ধি আর হিসেবে করে হাত বাড়িয়ে যদি নিজেকে ওর দিকে ছুঁড়ে দিতে, ও তাহলে ঠিকই আউট হয়ে যেত। সেটা করলে না। সব সময় লক্ষ্য রাখো, লক্ষ্য।

তোমাকে কী করতে হবে? ছুঁতে হবে। ছোঁয় মানে তুমি ছোঁও বা তোমার দলের যে আট জন দুই খুঁটির মাঝ বরাবর বসে আছে, তাদের কেউ ছুঁক। ব্যাপারটা একই। ফুটবল খেলার সময় যেমন বল বেশিক্ষণ পায়ে ধরে রাখতে নেই, তাতে প্রতিপক্ষে খেলোয়াড় এসে বল কেড়ে নিতে পারে, এখানেও তেমনি। পাস করো, পাস। যে সামনে আছে, তাকে খো দিয়ে পাঠিয়ে দাও ডিফেন্ডারকে ছোঁয়ার জন্য। আর যে সব চেজার বসে আছ, তারা একদম রেডি থাকো। যাতে খো পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো, বুঝেছো?

তিমিরের হঠাৎ মনে হল, এটা আসলে একটা ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা। ডিফেন্ডারকে আউট করতে হলে ছুঁতে হবে। আর এই খেলায় টিকে থাকতে হলে চেজারের ছোঁয়া থেকে নিজেকে

বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মানে, সবটাই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার। আহা, এটা যদি.... ভাবতে ভাবতে একটু অন্য মনস্ক হয়ে গিয়েছিল তিমির। ঠিক তখনই—

তোমাকে আর একটা কথা বলি। বলেই, উনি তিমিরকে বললেন, তুমি ওই পোলটাকে ধরে বাঁক নেওয়ার সময় নিজের ভারসাম্যটাকে ধরে রাখতে পারলে না কেন? শরীরটা ওদিকে এতটা ঝুঁকিয়ে দিলে যে আর একটু হলেই পোলটা ভেঙে যেত। তা হলে কী হতো জানো? তোমরা যে এই পর্বে এর মধ্যে পাঁচজনকে ম'র করেছ, সেটা বিফলে যেত। কারণ, পোল ভেঙে যাওয়ার জন্য এই পর্বটা বাতিল হয়ে যেত। নাও শুরু করো।

আবার বাঁশি বেজে উঠল।

তিমির পোলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এবার সে চেজ করার জন্য এগোবে। ও এখন অনূর্ধ্ব বারোয় খেলছে। এর পর অনুর্ধ চোদ্দয় খেলবে। তারপর অনূর্ধ্ব উনিশে। স্কুল লেবেলে ঠিক মতো খেলতে পারলে এখান থেকেই সোজা জেলার টিমে। জেলা থেকে রাজ্য। রাজ্য থেকে জাতীয় দলে।

না, জাতীয় টিমে নয়, গতবছর রাজ্য স্তরে চান্স পেয়েছিল তাদের গ্রামেরই এক ছেলে— নবাকু। নবাকু তাকে ক'দিন আগে বলেছিল, তাদের খেলা পড়েছিল কলকাতায়। রেড রোডের পাশে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মূর্তির কাছে। রাজ্য স্তরের খেলা বলে কথা। চাট্টিখানি ব্যাপার! আগের দিন সারা রাত দুচোখের পাতা ও এক করতে পারেনি। শুধু স্বপ্ন দেখেছে। এমনই, পাড়ায় ফুটবল কিংবা ক্রিকেটের সামান্য ম্যাচ হলেও কী ভিড় হয়ে যায়। সেখানে এটা তো রাজ্য স্তরের খেলা। সবক'টা রাজ্য একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। গ্যালারি উপচে ভিড় নেমে আসবে মাঠ পর্যন্ত। এক-একজন আউট হলেই উল্লাসে ফেটে পড়বে গোটা মাঠ। যে দলই জিতুক, তাদের সাপোর্টাররা বাজি ফাটিয়ে কান ঝালাপালা করে দেবে। আকাশ ভরে যাবে রঙে রঙে।

যে হোক। তবু নাকি ও ঠিক করেই রেখেছিল, যাই ঘটুক ও নিজে শান্ত থাকবে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে শুধু খেলে যাবে। এ সব অনেক কিছুই ভেবেছিল সে। কিন্তু ও যখন মাঠে গিয়ে পৌঁছল, সে তো

প্রথমে ভেবেছিল, সে বুঝি ভুল করে অন্য জায়গায় চলে এসেছে। কিন্তু যখন জানতে পারল, না। এটাই সেই মাঠ, তখন শুধু অবাকই নয়, একেবারে চূড়ান্ত হতাশ হয়ে গিয়েছিল ও।

মাঠ কোথায়! এটা তো মাত্র কয়েক হাত জমি। গ্যালারি তো অনেক দূরের কথা, সত্যি সত্যিই একজন দর্শকও নেই। শুধু দর্শক কেন, কোনও খেলোয়াড়ের সঙ্গেও কেউ আসেনি। যারা খেলবে শুধু তারাই এসেছে। আর যারা এসেছে, তাদের চেহারাই বলে দিচ্ছে, তারা প্রায় সবাই হাঁ-ঘরের ছেলে। এছাড়া এসেছেন শুধু জনাচারেক উদ্যোক্তা। যাঁরা একাধারে রেফরি এবং টাইমকিপার। রাজ্য স্তরের কোনও খেলার চেহারা যে এত হতদরিদ্র হতে পারে, তা নাকি নবাকুর ধারণাই ছিল না। সম্ভব হলে হৈ খেলা ছেড়ে সে তক্ষুনি অন্য খেলায় চলে যেত। নবাকু সে কথা খুব দুঃখ করেই তিমিরকে বলেছিল। বলেছিল, রাজ্য স্তরের খেলার কথা। কিন্তু রাজ্য স্তরে অমনটা হলেও তিমিরের দৃঢ় বিশ্বাস, জাতীয় স্তরে নিশ্চয়ই অতটা খারাপ অবস্থা হবে না। তাই মাঠে দাঁড়িয়ে তিমিরের মনে হল, স্কুল টিমে জায়গা পাওয়ার জন্য নয়, সে খেলতে নেমেছে জাতীয় দলে। সামনেই কোর্টের মধ্যে তিনজন ডিফেন্ডার। কে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ভাল করে দেখে নিচ্ছে সে। একজনকে টার্গেটও করে ফেলেছে। নিজে না পারলেও তার যে আটজন সঙ্গী সেন্টার লাইনে বিপরীতমুখী হয়ে পরপর বসে আছে, তাদের কাউকে না কাউকে ও ঠিক খো দিয়ে দেবে তাকে আউট করার জন্য।

খুঁটির কাছে দাঁড়িয় শেষবারের মতো ও যখন দেখে নিচ্ছে ডিফেন্ডাররা কে কোথায়, ঠিক তখনই কান বিদীর্ণ করা একটা চিৎকার ভেসে এল বহু দূর থেকে। ওর চোখ চলে গেল সেদিকে। ও দেখল, ওর ছোট ভাই ওর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে। ওইভাবে একটা ছেলেকে ছুটে আসতে দেখে বলরামবাবুও থমকে গেলেন। গেম টিচারও বাঁশি বাজাতে ভুলে গেলেন। তিমিরও দাঁড়িয়ে পড়ল।

ছেলেটা সামনে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে তিমিরকে বলল, দাদা, এক্ষুনি বাড়ি চল। বাবাকে সাপে কেটেছে।

সেটা শুনে তিমির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দিকে ছুট লাগাল।

গেম টিচার চেঁচিয়ে উঠলেন, কীরে, কোথায় যাচ্ছিস? দাঁড়া দাঁড়া। এভাবে চলে গেলে তোর নাম কিন্তু স্কুল টিম থেকে বাদ পড়ে যাবে। ফিরে আয়, ফিরে আয় বলছি। এইভাবে চলে যাস না।

কিন্তু ফেরা তো দূরের কথা, তিমির পিছন ফিরেও তাকাল না। সোজা ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে। সোজা। ■

দুষ্টু-মিষ্টি প্রাণী লিমার

তাপস অধিকারী

আফ্রিকার উপকূলবর্তী ভারত মহাসাগরের বুকে বিশাল একটি দ্বীপ। পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম এই দ্বীপের আদি বাসিন্দা এরা। দ্বীপটির নাম মাদাগাস্কার। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্রতীর থেকে আড়াইশো মাইল দূরে এর অবস্থান। মাদাগাস্কার বনভূমি, তৃণভূমি, প্রবাল প্রাচীর ঘেরা এক অত্যাশ্চর্য দ্বীপ। এখানে আছে বেশ কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ, যারা কেবলমাত্র এই দ্বীপেই আছে। বিশ্বের আর কোথাও নেই। এই দ্বীপের আদি বাসিন্দা লিমার বা লেমুর। পৃথিবীর আর কোথাও এদের দেখা মেলে না। কিছু কিছু লিমার থাকে আফ্রিকার কোমোরো ও নোসি দ্বীপগুলিতে। জার্মান ভাষায় লিমারকে বলে— 'হাব-আফেন', অর্থাৎ অর্ধবানর। দ্বীপে পাওয়া ফসিল বা জীবাশ্ম পরীক্ষা করে জানা গেছে, এরা মূল আফ্রিকা মহাদেশ থেকে মাদাগাস্কার দ্বীপে এসেছিল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, হয়তো এই দ্বীপটি কখনও আফ্রিকা মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রায় ছ'কোটি বছর আগে এরা এসেছিল। লিমার বা লেমুর নিশাচর। দিনের বেলা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। সাধারণত গাছেই বসবাস করে। শুধুমাত্র জলপান করার জন্য নীচে নামে। সতেরো প্রজাতির লিমার এখনও দেখা পাওয়া যায়। লিমার বা লেমুর শব্দটির অর্থ হলো — ভূত বা প্রেত। গভীর রাতে চুপিসারে শিকার ধরে, হয়তো এই কারণে এমন নাম। স্থানীয় লোকেরা আবার 'বেজি' বলে এদের। বিজ্ঞান পরিভাষায় বলে— লিমার বা লেমুর ক্যাটা (Limar or Lemur catta)।

চিড়িয়াখানায় এদের দেখা মেলে। রীতিমতো নজর কাড়ে এদের রকমসকম। বানরদের নিকট আত্মীয় বলা হয় এদের। এদের সম্পূর্ণ চেহারাটা অদ্ভুত। সমস্ত প্রজাতির লিমারের লেজ অত্যন্ত সুন্দর, আকর্ষণীয়। লেজ তো নয় যেন ঝাড়ন। একই দেহে কত রূপের খেলা। মুখের গড়ন খানিকটা শেয়ালের মতো, আবার কুকুরের মতো বলা যায়। ঠোঁটের দিকটা কাঠবেড়ালির মতো। সমগ্র আদলটা বানরের মতো। কানদুটো বেশ বড়। শরীর জুড়ে ঘন লোম। জীববৈচিত্র্য সততই আমাদের প্রেরণা দেয়। বিস্মিত করে। সমৃদ্ধ করে। লিমারের সমগ্র চেহারাটাই খুব মজার। এদের প্রধান আকর্ষণ হলো এদের চোখ। চোখ দুটো বেশ বড়। অন্ধকারে ঠিক যেন টুনিলাইট। দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। এদের ঘ্রাণশক্তিও প্রবল। আকারে মাঝারি ইঁদুর থেকে ছোট কুকুরের আকার পর্যন্ত হয়। লম্বায় ১২০ থেকে ৪৬০ মিমি হয়ে থাকে। এদের লেজ লম্বায় ১২০ থেকে ৫১০ মিমি হয়ে থাকে। দেখবার মতো এই লেজের কথা একটু পরে বলছি। পুরো লেজটাই আংটির মতো গোল গোল চিহ্নে ভরা থাকে। মাথা, ঘাড়, নরম রোমে ঢাকা। লিমারের হাতপায়ের আঙুল ঠিক সরু বাঁশের কঞ্চির মতো।

অত্যন্ত সক্রিয়, প্রাণচঞ্চল, মিষ্টি স্বভাবের লিমারদের মাদাগাস্কারের বহু মানুষ পোষেন। এরা সহজেই পোষ মানে। বন্দি অবস্থায় কিছুটা শান্ত প্রকৃতির হয়। বন্য জীবনে অসম্ভব চঞ্চল ও চটপটে। প্রচণ্ড দ্রুতগামী। এক গাছ থেকে আরেক গাছে চোখের পলকে লাফিয়ে যেতে

পারে। এমনকি মা-লিমার কোলে বাচ্চা নিয়েও দারুণ লাফ দিতে পারে। নিমেষে দৌড়ে গাছের একেবারে মগডালে উঠে যেতে পারে। লাফানো আর দৌড়ানোতে লিমারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে একমাত্র বানরই বোধহয়। এরা চলাফেরা করে জোড়ায় অথবা তিন-চারজনের দলে। বাচ্চা দেয় একটি অথবা দুটি। কয়েকমাস ধরে মা লিমার বাচ্চাকে দেখাশোনা করে। একটু বড় হলে তারপর কাছ ছাড়া করে। শিশু লিমাররাও হয় মা-অন্ত প্রাণ। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকে প্রায় পাঁচ মাস। মা যা-যা করে ওরাও তাই তাই অনুকরণ করে। মা ছাড়া ওরা যে তখন কিছুই জানে না। এমনিতে এরা স্বভাবে খুব নিরীহ। পোষ মানালে মানুষের পরিবারে এক সদস্য হয়ে যায়। সবার মনপ্রাণ জয় করার মতো ক্ষমতা এদের আছে।

দুষ্টুমিতে লিমারের জুড়ি মেলা ভার। আনন্দ পেলে তীক্ষ্ণ শিস দেয়। এরা কিন্তু নিরামিষের সাথে আমিষও খায়। কেউ কেউ মধু খায়। তবে ফল খেতেই পছন্দ করে বেশি। আর লড়াইতে? ভীষণ পটু। লড়াই করে দাঁত ও হাত দিয়ে। লিমাররা সাধারণত কচি পাতা, কুড়ি, ফুল, ফল, ছোট পাখি, পাখির ডিম, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি খায়। সমস্ত লিমারই পছন্দ করে সাধারণত জংলি জায়গা। বৃক্ষবাসী, তাই ঘন গাছপালাই পছন্দ। যত না বড় শরীর, তার চেয়েও লম্বা লেজ। এরা কেমন করে ঘুমোয় জানা যাক। নিজের শরীরটাকে নিজেরই লম্বা লেজে ভালো করে পেঁচিয়ে তারপর বিশ্রাম। একে অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে এদের তুলনা মেলা ভার। পরস্পরের লেজ দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ও করে। নিজেদের মধ্যে পরস্পরের গা খুঁটে দিচ্ছে, আদর-যত্ন করছে এমন দৃশ্যের দেখা মেলে চিড়িয়াখানায়।

এবার জেনে নেওয়া যাক কয়েকটি প্রজাতির লিমার-এর রকমসকম—

শান্ত লিমার : এরা বাঁশ ও নলখাগড়ার জঙ্গলে বসবাস করে। গোলাকার মাথা। নাক চওড়া। দেহের লম্বা আর লেজের লম্বা প্রায় সমান। গলার নিচটা সাদা, হলদেটে লাল আর বাকি শরীরের রঙ পাটকিলে ধূসর। নিশাচর। এদের প্রিয় খাদ্য ঘাস, ফড়িং। শিকার ধরতে দারুণ ওস্তাদ।

ভোঁদড় লিমার : দেখা মেলে দক্ষিণ ও পশ্চিম মাদাগাস্কারে। আকারে কিছুটা ভোঁদড় সদৃশ্য। এদের প্রিয় খাদ্য ফল। লিমার পরিবারে এরাই একমাত্র দিবাচর।

ইঁদুরে লিমার : শরীরের রঙ ধূসর ও সাদা। ইঁদুরের মতো ছোট্ট। বিজ্ঞান পরিভাষায় বলে— মাইক্রোসিবাস মিউরিনাস। এরা অত্যন্ত লাজুক। এদের পোষ মানানো বেশ শক্ত ব্যাপার। ওজন মাত্র চল্লিশ থেকে আশি গ্রাম। গাছের গায়ে গর্ত করে বাসা বানায়। তীক্ষ্ণ শিস দেয়। লম্বায় চার-পাঁচ ইঞ্চি। লেজ সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। এদের খাদ্য নানারকম ফল, পোকামাকড় ইত্যাদি।

আংটি লেজ লিমার : গোলাকার সাদা কালো আংটির মতো দাগ থাকে গোটা লেজ জুড়ে। লেজের সাহায্যে একে অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করে। এরা লিমার পরিবারে অত্যন্ত সামাজিক বলে চিহ্নিত। বিজ্ঞান পরিভাষায় বলে— লেমুর বা লিমার ক্যাটা। এরা ফল, ফুল, পোকামাকড় প্রভৃতি খায়।

বামন লিমার : গভীর জঙ্গলে থাকে। শরীরের থেকে লেজ বড়। গায়ের রঙ বাদামি। অন্য নাম— বাদামি লিমার। মুখটা কালো। চোখ বড় ও উজ্জ্বল। এদের প্রিয় খাদ্য ফল, পাতা, মধু ও ছোট পাখি। এরা ভালো পোষ মানে। গায়ের লোম খুব নরম আর দেখতে খুবই সুন্দর।

কাঠবেড়ালি লিমার : দেহের রঙ লালচে ধূসর। ঘন লোমে ঘেরা। চোখের ঠিক ওপর দিয়ে একটা কালো টানা দাগ পিঠ বরাবর দেখতে পাওয়া যায়। গলার দিকে ফিকে হলদে রঙ। পা বাদামি। অসম্ভব দ্রুত ছুটতে পারে। ফল খেতে পছন্দ করে। এরা কা-কা শব্দে ডাকে। সুবজ পাতা, মধু খেতেও পছন্দ করে এরা।

সোনালি ভ্রূ লিমার : কমলা রঙের গোঁফ। সোনালি ভ্রূ। এক কথায় রাজকীয় চেহারা। এদের প্রিয় খাদ্য বাঁশের ভেতরের নরম বস্তুটি।

হল্লাবাজ লিমার : এদের খাদ্য ক্যাকটাস জাতীয় গাছের ফুল ও পাতা। লম্বায় বাইশ ইঞ্চি। এরা সত্যিই হল্লাবাজ। অশান্ত। এরা চেঁচামেচি করে নিজ নিজ এলাকা সুরক্ষিত রাখে। এরা হয় কিছুটা দেমাকি ও রংবাজ প্রকৃতির।

গলায় প্রচুর লোমওয়ালা Ruffed limer মাদাগাস্কার দ্বীপে দেখা মেলে। বিজ্ঞান পরিভাষায় বলে— ভেরিয়াগাটাস (Variagatus), এরাও দেখতে খুব সুন্দর। প্রিয় খাদ্য পোকামাকড়, ফুল ও ফল। লিমারের চেহারাটাই খুব মিষ্টি। আকর্ষণীয়। লিমারের কথা শেষ করার আগে এদের বাচ্চা অবস্থাটা একবার দেখা যাক। জন্মানোর সময় এদের মাথা থাকে বেশ বড়। চোখ থাকে খোলা। গায়ে থাকে ছোট ছোট লোম। লেজে থাকে অল্প লোম। পরিশেষে বলি, আফ্রিকার ওই দ্বীপে যাঁরা চাষ-আবাদ করেন, তাঁদের শস্য ক্ষেতে মাঝেমধ্যেই হানা দেয় এই ক্ষুদে লিমারের ছোট ছোট দল। চাষিভাইরা কিন্তু একটুও রাগ করেন না, বরং খুশিই হন। ▮

অঙ্কের ধাঁধা

শৌনক রায়চৌধুরী

১। নীচের ধাঁধাটিতে প্রতিটি ইংরাজি বর্ণ ০ থেকে ৯-এর মধ্যে একটি করে অঙ্ককে প্রকাশ করে। দুটি আলাদা বর্ণ দুটি আলাদা অঙ্ককে প্রকাশ করে। তাহলে একটি ODD সংখ্যা, আবার EVEN-ও একটি সংখ্যা। তোমরা কি বলতে পারবে, তাহলে ODD + EVEN এই সমীকরণের উত্তর কি হবে?

২। আগের মতোই আরও একটি অঙ্কের ধাঁধা। SEND + MORE = MONEY। এর সমাধান কি হবে বের করো।

৩। এক কিশোরী সবে গাড়ি চালাতে শিখেছে। সে একদিন একটি একমুখী রাস্তা দিয়ে উল্টো দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ তাকে দেখলেও কিছু বলল না। তোমরা কি বলতে পারবে কেন?

৪। চীনদেশের কোনও মানুষের পক্ষে কি তার বিধবা স্ত্রীর পরের বোনকে বিয়ে করা উচিত হবে?

৫। তুমি কি কোনও ফুটবল খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে তার ফলাফল বলতে পারো?

হিতোরি

জাপানি সংখ্যার খেলা

হিতোরি খেলাটি জাপানে উদ্ভাবিত হয়। এই খেলায় ৮ X ৮ ঘর থাকে। প্রতিটা ঘরে ১ থেকে ৮-এর মধ্যে কোনও একটি সংখ্যা থাকে। অনুভমিক বা উল্লম্ব ভাবে কোনও সারিতে একই সংখ্যার পুনরাবৃত্তিগুলো বেছে নিয়ে বাদ দিতে হয়, যাতে খেলার শেষে প্রতিটি সারিতে প্রতিটি সংখ্যা সর্বোচ্চ একবার মাত্র থাকে। এই বাদ দেওয়ার জন্য যে চৌকোণা ঘরের সংখ্যাটিকে বাদ দেওয়া হবে, সেই ঘরে ০ বসানো হয়। নিয়ম হলো যে, পাশাপাশি দুটি ঘরে ০ থাকতে পারবে না। আর যে কোনও ঘর (০ বাদে) অন্য ঘরের (যাতে ০ নেই) সঙ্গে অনুভূমিক বা উল্লম্ব ভাবে জুড়ে থাকবে। তোমাদের জন্য একটি হিতোরি ধাঁধা দেওয়া হলো নীচে।

৩	৫	৩	৪	৩	৮	৫	১
৩	৪	১	৮	৭	২	৩	৫
১	৬	২	৬	৮	৬	৪	৫
৮	৭	১	৩	২	৪	২	৬
৫	৫	৪	৪	৩	৬	৭	২
৩	৩	৭	১	৪	১	২	৫
৪	৮	৩	১	৫	১	৭	৭
৭	৬	৫	২	৭	৩	৮	৪

অঙ্কের ধাঁধার উত্তর

১। এই ধাঁধাটির দুটি উত্তর হয়— (ক) ৬৫৫ + ৬৫৫ = ১৩১০ ও (খ) ৮৫৫ + ৮৫৫ =১৭১০। অর্থাৎ D = ৫, E =১, N = ০, O = ৬ বা ৮ এবং V = ৩ বা ৭।

২। এই ধাঁধাটির একটি মাত্র উত্তর হয়। ৯৫৬৭ + ১০৮৫ = ১০৬৫২। অর্থাৎ D = ৭, E = ৫, M = ১, N = ৬, O = ০, R = ৮, S = ৯, ও Y =২।

৩। কিশোরীটি হেঁটে উল্টোদিকে যাচ্ছিল, গাড়ি চালিয়ে নয়। তাই পুলিশ তাকে কিছু বলেনি।

৪। মানুষটি মারা যাওয়াতে তবেই তার স্ত্রী বিধবা হয়েছে। তো মানুষটি এ জন্মে আর কী করে স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করবে?

৫। নিশ্চয় পারো। খেলা আরম্ভের আগে ফলাফল ০-০।

হিতোরি ধাঁধার উত্তর

৩	৫	০	৪	০	৮	০	১
০	৪	১	৮	৭	২	৩	৫
১	৬	২	০	৮	০	৪	০
৮	৭	০	৩	২	৪	০	৬
৫	০	৪	০	৩	৬	৭	২
০	৩	৭	১	৪	০	২	০
৪	৮	৩	০	৫	১	০	৭
৭	০	৫	২	০	৩	৮	৪

SOCKS FOR STYLE DOWN TO YOUR FEET

Quality Products

B. K. International (P) Ltd.

Badli Gaon
DELHI-110 052

Phone : 2785-7039, 27857067 I Fax No.: 2785 7066

G. B. Auto Industries (Regd.)

C-84, Focal Point, Phase-V
Dhandari Kalan
Ludhiana - 141 010
Office : 0161-2677500, 2671600, 2671700
Fax : 161-2671500,
Resi. : 0161-2608700
M : 94172-71500, 96460-61700
E-mail : gbskg@yahoo.in
gbautoind@yahoo.co.in
Web : www.gbautoindustries.com

With Best Compliments from :-

A Well Wisher

With Best Compliments from :-

R K Global

NSE | BSE | MCX | NCDEX | MCX-SX | NSDL

R K Global

With Best

Compliments:-

Anderson Wright International

মঞ্জুভাস প্রকাশিত

গুরু বিশ্বাস-এর উপন্যাস

সাড়ে চারশ পাতা জুড়ে বইটি কেবল অরণ্যের কথা, অসহায় আরণ্য প্রাণীদের কথা, মানুষ নামের অসংখ্য পোকার কথা এবং একটি লোকের মনুষ্যত্বে আরোহনের কথা

পোকা

একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস, ৫ম মুদ্রণ ২৫০্

বাংলা সাহিত্যে যে বিষয় নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়নি তেমনই এক দরদী কথা

স্বপ্নলোকের চাবি ২৫০্

কেউ ভেবেছেন কলকাতা নগরীকে তিনশো বছর ধরে যারা পরিষ্কার রাখছে তাদের জীবন নিয়ে গ্রন্থ লেখা যায়? সেই কথা

ঝোপড়পট্টি ২৫০্

বিশ্বের প্রাচীনতম পেশা পণ্য নারীদেহ বিক্রয়ের বৃহত্তম বাজার নিয়ে উপখ্যান

পরীতলা

(১ম) খণ্ড তৃতীয় মুদ্রণ ২৫০্

(২য়) খণ্ড তৃতীয় মুদ্রণ ২৫০্

বীজ ৩৫০্

আর সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

অরিষ্ট ১৭০্

প্রশান্ত প্রমাণিক-এর

ভারতবর্ষের প্রাচীন বিজ্ঞান-এর কথা

কপিল থেকে চন্দ্রশেখর ৬০০্

ও

সদ্য দেখে আসা

বিস্মরণে বাঙালি বিজ্ঞানী ২৪০্

মানসের তীরে মহিমান্বিত কৈলাস ১২০্

প্রিটোনিয়া ১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯

☎২২৪১-২১০৯/৯০৬২৪৭৪৭৪০

publishers.pritonia2015@gmail.com

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক অভিনন্দন—

A Well Wisher

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের

অত্যাধুনিক গয়নার ডিজাইনের ক্যাটালগ

সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন

ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন

9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana (NR) ®

SAREES • SUITS

Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees

Contact No. : 033-22188744 / 1386

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই—

Geeta SAREES

Golden Collection

M/s. Sharda Textiles

With Best
Compliments from :-

A
Well
Wisher

MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.

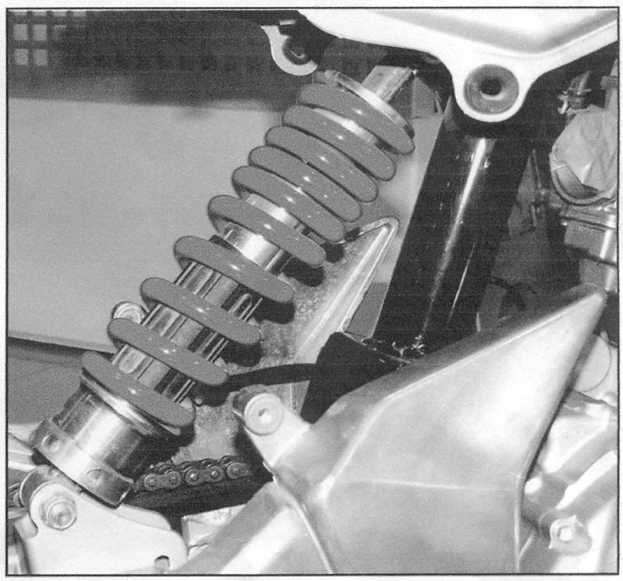

TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 – 2002 Certified

ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified

Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

- **Struts/Gas Struts**
- **Shock Absorbers**
- **Front Forks; and**
- **Gas Springs**

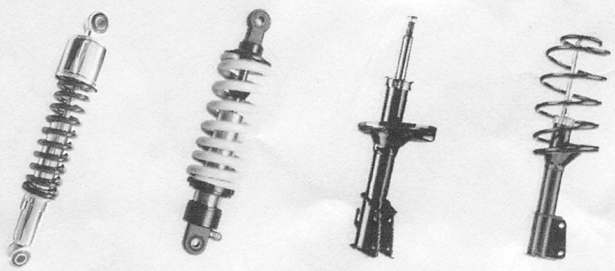

MUNJAL SHOWA LTD.

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100
• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100
• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100